বন্দী-জীবন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

কেমন করিয়া কৃপাল সিং এই দলে প্রবেশ লাভ করে এবং কবে কিরূপে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয় সে সকল বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করিব। তৎপূর্ব্বে এই শিখ দলের কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

এই শিখ দলের লোক সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। উত্তর আমেরিকা ও কানাডা হইতে বিভিন্ন দলে প্রায় ৬।৭ হাজার শিখ দেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের Ingress Ordinance act অনুযায়ী বহুলোক জেলে আবদ্ধ হইয়া যান, এবং আরও বহুলোক নজরবন্দী হইয়া নিজ নিজ গ্রামে থাকিতেই বাধ্য হন। যাঁহারা নজরবন্দী হন তাঁহারাও বিপ্লব কার্য্যে সাহায্য করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। কারণ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে ইঁহারা কেহ বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না। পুলিস যে কোন সময় যাইয়া ইঁহাদের খোঁজ খবর লইত। সূর্য্যোদয়ের পরও ইঁহারা কেহই স্বীয় গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না অথবা ভিন্ন গ্রামের কোনও ব্যক্তি ইঁহাদের সহিত প্রকাশ্যে মিশিতে পাইতেন না। পরে যখন কার্য্য বেশ সুসম্বদ্ধরূপে আরম্ভ হয় তখন ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের দেশের কাজ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল তাঁহারা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া গা ঢাকা দিলেন। অর্থাৎ পুলিশ অথবা তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা আর কেহ তাঁহাদের খোঁজ খবর পাইতেন না।

যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই সকল দল ভারতে আসিয়াছিলেন স্বদেশে পদার্পণ করিবার পর হইতে তাঁহাদের অনেকের মধ্যই সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এই ৬।৭ হাজার আমেরিকাপ্রত্যাগত লোকদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক নিজ নিজ গৃহস্থালিতেই মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট শিখেরা পূর্ণ উদ্যমেই বিপ্লব কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন।

এই সব আমেরিকাপ্রত্যাগত লোকদিগের অধিকাংশই ছিলেন শিখ। অ-শিখের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। বোধ হয় ২৫।৩০ জনের বেশী হইবে না।

তাঁহারা প্রায় সকলেই পূর্ণ বয়স্ক গৃহী ছিলেন। অনেকেরই স্ত্রী পরিবার, পুত্র কন্যা সবই ছিল। তাঁহাদের অনেকের বয়স ৪০ সেরও উর্দ্ধে দেখিয়াছি। অন কএক ত বৃদ্ধই ছিলেন। ভাই নিধান সিং, ভাই সোহন সিং, ভাই কালা সিং, ভাই কেরসিং ইঁহাদের কাহারও বয়স ৫০ সের নিয়ে ছিল না।

দিল্লির ষড়্‌যন্ত্র মামলাতেও যাঁহারা ধরা পড়েন তাঁহাদেরও অনেকেই পরিণত বয়সের লোক ছিলেন। আমির চাঁদের বয়স ৫০ সেরও উপর ছিল। আবধ বিহারিও পরিণত বয়স্ক ছিলেন।

কেবল বাঙ্গলাদেশেই প্রধাণতঃ ছাত্র শ্রেণীর বালক ও যুবক দিগকে লইয়াই বিপ্লব দল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাদের অনেকেরই সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশেরই :বয়স ১৬ হইতে ২০।২২ সের অধিক হইবে না। বাংলাদেশে ইহাই প্রায় দেখা যায় যে যাঁহাদের বয়স ৩০ সের কোটা পার হইয়াছে তাঁহাদের সকল উৎসাহ সকল উদ্যম প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসে, তখন তাঁহাদের দ্বারা কোনও রূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ভিন্ন আর কিছু কাজই হইয়া উঠে না। বাঙ্গলাদেশের যাহা কিছু আশা ভরসা মনে হয় তাহা কেবল স্কুল কলেজের যুবকদিগের তরুণ মনের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। কিন্তু বাঙ্গালার কর্ম্মীদিগের সাংসারিক অভিজ্ঞতা অল্প থাকিলেও, তাঁহাদের অধিকাংশই তরুণবয়স্ক হইলেও তাহাদের মধ্যে এমন একটী একাগ্র সাধনা দেখিয়াছি যাহা বাঙ্গালার বাহিরে আর কোথাও দেখি নাই।

বাঙ্গালী যখন যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা যেন একান্ত প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। তাই দেখি বৌদ্ধ যুগে বাঙ্গালী যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিল এমন আর অন্য কোন প্রদেশের লোকই পারে নাই এবং শেষে যখন অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল তখন তাহারা বাঙ্গালীকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করে কারণ বাঙ্গলা দেশ তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তেমনি পূর্ব্বের মতনই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। আবার ইংরেজি আমলেও বাঙ্গালী যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও গ্রহণ করিয়াছিল এমন আর অন্য কোন দেশই করে নাই। ইহা বাঙ্গলার গুণই হউক আর দোষই হউক বাঙ্গালী যখন যাহা ধরে তাহা সর্ব্বস্ব দিয়াও বরণ করিয়া লয়। তাই বর্ত্তমান যুগেও বাঙ্গালী যখন দেশহিতকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তখন আর দোমনা হইয়া করিতে পারে নাই, তাহার আর সংসার করা হইল

না, অর্থোপার্জ্জন করা পোষাইল না, একেবারে ঘর সংসার ছাড়িয়া তাহাকে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

এই সকল যুবকদিগের অনেকের মধ্যে কেমন এক অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রেরণার আভাস পাইয়াছি। ইঁহারা কেবলমাত্র হুজুগ লইয়াই মত্ত থাকেন নাই। দেশসেবা ইঁহারা একরূপ সাধনার অঙ্গ স্বরূপই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিসে মানুষ হইব, কিসে চরিত্রবান হইব এই ভাবনা ও ধারণা ইঁহাদের মধ্যে দৃঢ়রূপেই বদ্ধমূল হইয়াছিল।

কিন্তু এই ভাবটি দুই তিন জন শিখ ভিন্ন আর কাহারও মধ্যে দেখিতে পাই নাই। এবং যুক্ত প্রদেশের যে সকল বিপ্লবপন্থীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মধ্যেও বাঙ্গালার আদর্শের কথার অবতারণা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারাও ইহা প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের ওষ্ঠপ্রান্তে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসির রেখাই ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়াছি।

শিখদিগের প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল, দুর্জ্জয় সাহস ছিল, এবং তাঁহারা নিরতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁহাদের বিশাল সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষ ও সুসম্বদ্ধ মজ্জাদেশ সকলকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহাদিগের গুম্ফ, শ্মশ্রু মণ্ডিত দৃঢ়তাব্যঞ্জক বদনমণ্ডল দেখিয়া অনেক উৎপীড়কই ভয়ে পশ্চাৎপদ হইত। তাঁহাদের চলন ভঙ্গিমায় এক বিশিষ্টভাব ফুটিয়া উঠিত, বেশ বুঝিতে পারা যাইত যেন তাঁহারা দুই পায়ের উপর সমান ভর দিয়া চলেন; কিন্তু অজাত-শ্মশ্রু কোমলাঙ্গ নিরীহ নম্রপ্রকৃতি বাঙ্গালী যুবকদিগের মত ইঁহাদের চরিত্র অমন উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিল না। অবশ্য ইহা আমি সাধারণ ভাবে বলিতেছি, কারণ ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজন শিখের উপর আমার খুবই উচ্চ ধারণা আছে। আমার আণ্ডামানের কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

সাধারণত শিক্ষিত বলিলে আমাদের মনে যে ধারণা হয় এই সব আমারিকা প্রত্যাগত দলের মধ্যে সেরূপ শিক্ষিত কেহ ছিল না বলিলেই হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর মত কেবল ঘর মুখো না থাকায় ইহারা অনেকেই শুধু অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাবের বাহিরে গিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ, শ্যাম, মলয়াউপদ্বীপ সমূহ ও চীন দেশের নানাস্থানেই ইহাদের গতিবিধি আরম্ভ হয়। ওদিকে কানাডা ও উত্তর আমেরিকারও বহু স্থানে ইহারা একই উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ্গ ও হংকং এ

প্রধানত ইহারা ইংরাজের সৈনিক ও মিলিটারি পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তবে সায়াম, মলয় উপদ্বীপ ও চীন দেশের নানা স্থানে অনেকে কুলি মজুরেরও কাজ করিতেন, অনেকে আবার কন্ট্রাকটারি ও অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায়ও নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কানাডায় ও আমেরিকায় ইঁহারা প্রধানতঃ কুলি মজুর রূপেই জীবন যাপন করিতেন। আমেরিকার কোন কোনও কারখানায় আমেরিকা বাসীদিগের অপেক্ষা ইহারাই অধিক সমাদৃত হইতেন। ইহারা আমেরিকাবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন সুতরাং উপার্জ্জনও যথেষ্ট করিতেন। এই জন্য অনেক সময় ইঁহাদের সহিত আমেরিকাবাসীদিগের ঘোর বিবাদ চলিত। ইঁহাদের মুখে শুনিয়াছি একবার একটি সহরে মনোমালিন্য এতদূর গড়াইয়াছিল যে এক প্রচণ্ড বিবাদের সূত্রপাত হয় তাহাতে সহরের যত শিখ সব একদিকে আর যত আমেরিকাবাসী মজুর সব আর একদিকে ও লাঠি সোটা লইয়া রীতিমত মারামারি আরম্ভ করিয়া দেয় কিন্তু ইহাতেও সরকার পক্ষ হইতে শিখদের তেমন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। ভারতে এইরূপ হইলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াইত কে জানে! ঐ সব আমেরিকাপ্রত্যাগত শিখেরা সেরূপ শিক্ষিত না হইলেও নিজেদের মাতৃ-ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি প্রায় সকলেই পাঠ করিতে পারিতেন এবং নিজের গ্রামের শিখজাতির শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। ঐরূপ শিক্ষা কল্পে সেই সব আমেরিকাবাসী শিখেরাই আমেরিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া কয়একবার ১০ হাজার ১৫ হাজার করিয়া টাকা দেশে পাঠাইয়া-ছিলেন! আমেরিকার স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে বাস করায় এবং যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম হওয়ায় ইহাদের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ইঁহাদের অনেকেই আমেরিকায় যাইয়া ও স্বীয় বেশ ভূষা পরিত্যাগ করেন নাই এবং অনেকেই স্বহস্তে পাক করিয়া দেশী ধরণেই আহার বিহার সমাধা করিতেন। দেশ হইতে যখন প্রথম আমেরিকায় যান তখন হয়ত ইংরাজি একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমেরিকা গিয়া কেমন একরূপ আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি বলিতে শিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মুখে সেইরূপ আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি বুলি শুনিতে বড় আমোদ অনুভব হইত। এইরূপ ইংরাজি বলিয়াই ইঁহারা আমেরিকায় আপনাদের সকল কাজ বেশ সুন্দর রূপেই চালাইয়াছিলেন এবং উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু আমেরিকায় প্রবাসের ফলে তাঁহারা স্বদেশের সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই।

এমন কি তাহারা আমেরিকায় কুলি মজুরের কাজ করিলেও দেশে কি হইতেছে না হইতেছে এ সকল সংবাদ লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিতেন। বাঙ্গালা-দেশের সে দিনের সে নব জাগরণের তরঙ্গ যেমন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একটা ভাবের হিল্লোল তুলিয়াছিল তেমনি আমেরিকার সুদূর তটপ্রান্ত ও প্রহত করিয়াছিল। যখন ভারতের বিপ্লবস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল তখন আমেরিকাতেও কয়একজনের অন্তরে অন্তরে সে অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ভাই কারতার্ সিং নামক একটি তরুণ যুবক ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়েন। ইনি উড়িশ্যার র‍্যাভেনস কলেজের প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ সমাধা করিয়া বিশেষ কারণে আমেরিকায় চলিয়া আসেন। ইনি শিখদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠদিগের মধ্যে একজন হইলেও ইঁহার অধিনায়কত্বে অনেক বয়স্থ শিখকেও কাজ করিতে দেখিয়াছি। ইনি তাঁহার মতাবলম্বী আরও দুই এক জনের সঙ্গে মিলিয়া একটি সংবাদ পত্র বাহির করিতে সংকল্প করিলেন এই সময় পাঞ্জাবের স্বনামখ্যাত কর্ম্মী লালা হরদয়াল ভারতে বিপ্লবের সকল আশা ত্যাগ করিয়া আমেরিকান সোসিয়ালিষ্টদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কারতার্ সিং ও তাঁহার বন্ধুরা এই সময় হরদয়ালের নিকট ঐরূপ কাগজ বাহির করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হন। স্বদেশপ্রেমিক হরদয়াল এইরূপ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন, সুতরাং সানন্দচিত্তে উহাতে যোগদান করেন। এইরূপে "গদর" নামের বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ইহাই "গদর" দল গঠন করিয়া তুলে। ক্যালিফর্ণীয়া যুগান্তর আশ্রমই ছিল ইহার কেন্দ্রস্থল।

বিংশ শতাব্দীর মহাসমরের প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবপন্থীর দল বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের সহিত জার্ম্মণির বিরোধ এত শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবে। ইঁাদের বিপ্লবায়োজনও এরূপ ভাবেই হইতে ছিল। যেন আরও ১০।১৫ বৎসর পরে প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হইবে। এই জন্যই ইঁহারা এই মহাসমরের সময় বিপ্লবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতের বিপ্লব দলের সহিত ভারতের বাহিরে কোনও বিপ্লবপন্থীর তেমন কোনই যোগাযোগ ছিল না। এই জন্যই আমেরিকার বিপ্লবপন্থিগণ যখন দলে দলে ভারতে আসিতে লাগিলেন ভারতবাসী বিপ্লববাদীরা তখন তাঁহাদের সহিত তেমন ভাবে সময় মত মিলিয়া উঠিতে পারেন নাই, পারিলে হয়ত ভারতের ভাগ্য আজ অন্যবিধও হইতে পারিত।

আমেরিকা প্রবাসী বিপ্লবপন্থিগণও বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের সহিত জর্ম্মণির এত শীঘ্র যুদ্ধ বাধিবে, সেই জন্য তাঁহাদেরও আয়োজন এক ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ভারতের বাহিরের কোনও রাজ শক্তির সহায়তা লইয়া সমরায়োজনের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবারও বহু আয়োজন হইতেছিল, ঠিক এমন সময় ইউরোপে মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়া গেল। সকল সংকল্প একেবারে চূর্ণ হইল। তখন ইঁহারা দলে দলে ভারতে আসিয়া ভারতীয় সৈনিকদিগকে হাত করাই বিপ্লবের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। হাজারে হাজারে শিখ বিদেশে নিজেদের সকল আস্তানা গুটাইয়া লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট কিন্তু ইঁহাদের অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ ইঁহারা আমেরিকায় প্রকাশ্য সভায় ভারতের বিপ্লববিষয়ে বক্তৃতাদি করিতেন। "গদর" কাগজ প্রকাশ্য ভাবেই মুদ্রিত হইত। ৫৭ সালের মহা-বিপ্লবের ১০ই মে তারিখ এক উৎসবে পরিণত করা হইত। লালা হরদয়ালের উপরেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ খরদৃষ্টি ছিল, কয়একবার তাঁহার 'দিন-লিপি'ও অদ্ভুত উপায়ে অপহৃত হয়। শেষে যখন তাঁহাকে ধরিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন জনৈক আমেরিকান তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। সুতরাং হরদয়াল ও অন্যান্য ভারতীয়গণ আমেরিকা ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিলেন।

বিভিন্ন স্থানের জর্ম্মণ কন্সলেরা তখন ভারতের বিপ্লব প্রয়াসীদের নানারূপে সাহায্য করিতেছিলেন। আমেরিকা-প্রত্যাগত দলেরা তাহাদের সহিত দেখা করিবার সুযোগ পাইলে কখনই পরিত্যাগ করেন নাই।

এইরূপে কয়েকজন ইউরোপের দিকে যাত্রা করিলেন এবং অবশিষ্টাংশ সকলে ভারতের দিকে আসিতে লাগিলেন। পথে ইঁহারা যেখানে সেখানে নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে থাকেন। এইরূপ একটি দল জাপানের বন্দরে উপস্থিত হইলেন। পরমানন্দ নামে ছিপছিপে ধরণের এক তরুণ যুবক ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ইঁহার বাড়ী ঝাঁসিতে। আণ্ডামানে আমরা ইহাকে ছোট পরমানন্দ বলিতাম, কারণ বড় পরমানন্দ ছিলেন লাহোরের ডি, এ, ভি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ। ইনিও লাহোরের ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি পাইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে শিখ অভ্যুদয়ের সময় স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য যখন নির্ভীক দেশ

ভক্তেরা মুসলমান অত্যাচারের সম্মুখে অকাতরে প্রাণ বলি দিতেছিলেন, এই ভাই পরমানন্দের এক পূর্ব্বপুরুষ তখন আত্মবলিদানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে নাকি মুসলমানেরা করাত দিয়া বিদীর্ণ করিয়া মারিয়াছিল। তখন হইতেই শিখেরা এই বংশের সকলকে "ভাই" আখ্যা প্রদান করেন। শিখদিগের মধ্যে এই "ভাই" আখ্যা অতিশয় সম্মান সূচক। সেই জন্যই আমরা সকল শিখকেই তাঁহাদের নামের সহিত "ভাই" শব্দ যোগদিয়া ডাকিতাম।

ভাই ভগবান সিং নামে শিখদিগের এক অতি উৎসাহী নেতা ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কত শিখ নিজের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বিপ্লব কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল ক্ষণিক উত্তেজনাবলেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই বিপ্লব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে সত্যসত্যই দেশসেবার একটা প্রেরণা জাগিয়াছিল। এইরূপে দেশপ্রত্যাগত অনেক শিখের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যাঁহারা প্রকৃতই প্রাণের পরতে পরতে পরাধীনতার জ্বালা বুঝিয়া বিপ্লব কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহ পেনাঙ্গে মিলিটারি পুলিসের কাজ করিতেছিলেন, কেহ হংকং এ পাহারাওয়ালা ছিলেন অবার কেহ বা ব্যবসা পরিচালনা করিতেন। এই সময় হংকংএ এক শিখ রেজিমেণ্ট ছিল। এই রেজিমেণ্টেও ইঁহারা আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

ভারতপ্রত্যাগত দলের অনেকে ইংরাজ রেজিমেণ্টের সৈনিকদলভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা কেহ ৮ বৎসর, কেহ ১০ বৎসর আবার কেহ বা ১১ বৎসর ধরিয়া রেজিমেণ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই সকল পূর্ব্বতন সৈনিকদিগের মধ্যে কাহারও তিন বৎসরের কম অভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ প্রত্যেক সৈনিকের অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য কর্ম্ম করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মেশিন গান্ চালক ছিলেন, অনেকে তোপ খানারও কাজ করিয়াছিলেন।

ভারতে আসিবার পথে পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ইঁহাদিগকে ভারতে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইঁহারা কেহ বলেন বিবাহ করিতে যাইতেছি, কেহ বলেন বহুদিন যাবত গৃহছাড়া আছি তাই বাটী ফিরিতেছি ইত্যাদি। পরে আদালতে বিচার কালেও বিচারক যখন ইঁহাদিগকে ভারতে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখনও ইঁহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্তি

উত্তরই দিয়াছিলেন, কেবল একজনের উত্তর একটু ভিন্ন প্রকারের হইয়াছিল। বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করেন "তুমি দেশে ফিরিলে কেন?" তখন উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ইহা আমার স্বদেশ বলিয়া। এই পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণটির নাম জগৎরাম, ইনি "গদর" পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি "গদর" মানে মিউটিনি, অর্থাৎ "সিপাহিবিদ্রোহ"।

ভারতপ্রত্যাগত শিখদিগের মধ্যে অদম্য উৎসাহ থাকিলেও কার্য্য করিবার রীতি নীতিতে তাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ দিলেন। ইঁহাদের কোনও কেন্দ্র ছিল না, কোনও শাখা ছিল না। একজনের অধীন হয় ত ২০।৫০ জন করিয়া লোক থাকিত। তাঁহাকে ঐ ২০।৫০ জনের সর্দ্দার বলা হইত। এই সর্দ্দারেরা কখনও একত্র হইতেছেন, কখনও বা পরস্পরের সহিত কিছুদিন ধরিয়া দেখাই হইত না। মোট কথা সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার তাহাদের একটা শৃঙ্খলা ছিল না। কারণ কেন্দ্র ত কোথাও ছিল না। এইরূপে কত লোক নিতান্ত অব্যবস্থিতের মত দেশময় হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার সংবাদ কে রাখে? যাঁহারা মুলতান জেলে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারাও কেবলই বলিতেন যে শীঘ্রই বিপ্লব আরম্ভ হইবে এবং তাঁহাদিগকে অতি সত্বর জেলমুক্ত করা হইবে। ফলে কিন্তু অবিলম্বে ইঁহাদিগকে বিভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সমানধর্ম্মী একভাবে ভাবুক বহুলোক একস্থানে থাকিলে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে আনন্দ হইতেও এইরূপে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন।

এই সব দল ভারতে আসিয়াই বাঙ্গালার বিপ্লবপন্থীদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াদিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় না থাকায় পাত্রে অপাত্রে পাঞ্জাবের বিদ্রোহের কথা বলিতে লাগিলেন। এই সময় কলিকাতার সাধারণ পথেও আমি শুনিয়াছি যে পাঞ্জাবে বিপ্লবের আয়োজন চলিতেছে। "ভারত রক্ষা" আইনের পত্তনকালে হার্ডিং সাহেব এই কথারই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কারতার সিং এই সময় বাঙ্গালার কোনও সুপরিচিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নেতার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন "তোমরা নিজেদের সুবিধা ও সংকল্পমত কার্য্য করিয়া যাও, বাঙ্গালা ঠিক সময়ে তোমাদের সাহায্য করিবেই" অথবা এইরূপই একটা কিছু বলিয়াছিলেন, এখন আমার তাহা ঠিক স্মরণ নাই।

এই সময় ইঁহাদের অস্ত্র স্বল্প অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। যদিও এই

বিপ্লবের প্রধান অবলম্বন ছিলেন পাঞ্জাবী সৈনিকের দল তথাপি আত্মরক্ষার্থে ও যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কর্ম্মীকেই সশস্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে কিছু রিভলভার ইত্যাদির আবশ্যকতা হইল। এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত জগৎরামকে কিছু টাকা দিয়া কাবুলের দিকে প্রেরণ করা হয়। জগৎরাম বেচারা পেশাওয়ারেই ধৃত হইলেন এবং এখন হইতেই তাঁহার কারাযন্ত্রণা ভোগের আরম্ভ হয়। পরে ইঁহার সহিত আমার আবার আন্দামানে সাক্ষাৎ হয়।

(৪)

ঝাঁসির পরমানন্দকেও ইঁহারা বাঙ্গলাদেশে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিও বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এই বিপ্লবায়োজনের সময় কাশীতে বাহিরের লোকের সহিত দেখাশুনা করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষ বাটী নির্দ্ধারিত ছিল। পাঞ্জাব হইতে কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাঁহারা ইহারই একটি বিশেষ বাটিতেই প্রথমে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে সংবাদ পাইলেও দূর হইতে অলক্ষ্যে আগন্তুককে চিনিয়া লইলে তবে তাহার সহিত দেখাশুনা করা হইত। সেদিন কাশীতেই ছিলাম। পাঞ্জাব হইতে দলের একটি লোক পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট উপনীত হইয়াছেন। বিপ্লবের জন্য দুই তিন হাজার শিখ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার মুখে এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া আমাদের অন্তরতম পুরুষটি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। পাঞ্জাবের সহকর্ম্মিগণ ইঁহার মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলন যে তাঁহাদের রাসবিহারীকে নিতান্তই প্রয়োজন। দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারি আসামী প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর রাসবিহারীর নাম সে সময় আমেরিকাতেও প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমেরিকায় থাকিতেই তাঁহারা রাসবিহারীর নাম শুনিয়াছিলেন।

রাসবিহারী নানাকারণে তখন যাইতে পারিলেন না সুতরাং প্রথমে আমারই পাঞ্জাব যাওয়া স্থির হইল। কথা বার্ত্তায় ঠিক হইল যে পাঞ্জাবের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া সকলের গোচর করিলে, পরবর্ত্তি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইল যে জালান্দার সহরে গিয়া শিখদিগের নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তখন নবেম্বর মাস প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। পশ্চিমে তখন রীতিমত শীত পড়িয়াছে। সেই শীতকালের সকালে লুধিয়ানায় আসিয়া

পহুঁছিতেই দেখি আমার বন্ধুটির পরিচিত একটি তরুণ শিখ ষ্টেসানে আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। বন্ধুটি ইহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইঁহারই নাম কারতার সিং। কারতার সিং গাড়িতে উঠিয়া আমাদের সহিত জলন্দরাভি-মুখে চলিলেন। পথে যৎসামান্যই আলাপ হইল। শুনিলাম লুধিয়ানায় সে সময় ২১৩শ লোক একত্র হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্নদিকে প্রেরণ করা হইবে। তাঁহারা সকলে গুরুদ্বারায় অধ্যয়ন করিবার উপলক্ষ করিয়া মিলিত হইতেন। ক্রমশঃ

পতিতার সিদ্ধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(২৯)

অন্ধকারে রিভলবারের নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্রজেন্দ্রের সাময়িক উত্তেজনা চলিয়া গেল। আবার যখন কোচয়ান আসিয়া জানাইল আস্তাবলের সুমুখের রাস্তা জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গাড়ী লইয়া আসা অসম্ভব, তখন তাহার উত্তেজনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহাও আর রহিল না।

উত্তেজনান্তে অবসাদে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া কিছুক্ষণের চিন্তায় যখন ব্রজেন্দ্র আপনাকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, তখন ঘড়ীতে চারটে বাজিয়াছে।

"রিভলবার লুকিয়ে রেখে তুই বন্ধুরই কাজ করেছিস হেমা।" "সেকি বাবু, একটা শুটাকে মেরে আপনাকে খুনের দায়ে পড়তে দেব?"

"না যাওয়াটাই ভাল হয়েছে, চোখের উপর হু'টোকে দেখলে হয়ত রাগ সামলাতে না পে'রে কিছু একটা ক'রে বসতুম।" "গেলে বাবু, ঠিক দেখতে পেতেন।"

"হেঁটেই একবার যাব নাকি?"

"এখন গেলে আর কি দেখা পাবেন বাবু! সে ধূর্ত্ত বামুন এতক্ষণে ঠিক স'রে পড়েছে।"

"আলোটা জালাবার ব্যবস্থা কর্ দেখি, চিঠি খানাতে কি লিখেছে দেখি।"

"চিঠিখানা ঘরে নিয়ে এস, সেই খানেই দেখবে।"

হেমা এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মত প্রভুর পশ্চাতে ইজিচেয়ারের অন্তরালে মাথা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, আর ব্রজেন্দ্র দোরের ফাঁকের ভিতর দিয়া বিরাট শূন্তের সঙ্গে দেখা করিতে চোখ দু'টাকে কপালের দিকে উঠাইয়া দিল—নির্ম্মলা ত তা হ'লে দোরের আড়াল হইতে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে।

ঘরের বিপুল নিস্তব্ধতায় নির্ম্মলাও বুঝিল, তাহার অতর্কিত আগমনে, স্বামী ও হেমা দু'জনেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। "উঠে এস।"

বাঙ্‌ নিষ্পত্তি না করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে আসিল। হেমাও তার পিছন পিছন বাহিরে আসিল, এবং পুরস্কারের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, তার প্রভুপত্নীকে শুনাইয়া বলিল—"কিন্তু বাবু, সে বামুন বেটাকে আপনাকে কিছু শিখিয়ে দিতেই হইবে।"

"সে কি আর এ বাড়ীতে আস্‌বে?"

"ঠিক আসবে—আমাকে সে দেখতে পায়নি বাবু।"

"ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ ক'রে কি হবে হেমা!"

"কে বামুন?" নির্ম্মলার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকেই বলিতে লাগিল—"তবে তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবো না।"

নির্ম্মলা কে বামুন বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ঠিক্ হয়েছে—বাবুর যেমন নারায়ণে ভক্তি, তার পূজারি ত সেইরকম হওয়া চাই। বামুনের দোষ কি, সে ঠিক কাজই করেছে।"

ব্রজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হেমা বলিতে নিরস্ত হইল না। উল্লাসে প্রভুপত্নীকে শুনাইবার ইচ্ছাতেই বলিল—"সে যা বল, আমি শুনবো না মা। সে বাড়ীতে এলে আমি ত কান ধরে তাকে ছুচারপাক ঘুরুবোই, তাতে যা থাকে অদৃষ্টে। বাবু! আপনিত দেখেন নি—বেটা বামুন একবার দেখিনা একখানা গরদ প'রে,—আবার খানিক পরে দেখি, কি বল্‌ব মা, বাবু সেই বেটিকেসে দিন যে সেই দেড়শোটাকা খরচ ক'রে চেলি কিনে দিয়েছিলেন—সেই খানা প'রে বরটির মতন না সেজে—উঃ! এখনও পর্য্যন্ত রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যাচ্ছে—"

নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তা বলে বামুনকে মারতে হবে?"

"যে ছুটির বাড়ীতে ফলার মারে সে আবার বামুন কি?"

"তা হ'লে তোর বাবু কি ?" আরও কিছু এই বেশ্যাগৃহে আহারের ব্যাপার লইয়া স্বামীর সম্বন্ধে নির্ম্মলা বলিতে যাইতেছিল, কথা সংযত করিয়া সে কেবল রাখুর উপর কোনও অসদ্ব্যবহার করিতে হেমাকেই নিষেধ করিল।

বলিল—"খবরদার, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলে যেন তাকে একটীও অকথা শুনিয়ো না, একটি তামাসার কথা পর্য্যন্ত কয়ো না—যা কিছু তাকে বলবার আমি বলব।" বলিয়া, ক্ষুব্ধ নির্ব্বাক স্বামীকে হাত ধরিয়া সে ভিতরে লইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া নির্ম্মলা দেখিল শুভা ঘুমাইয়াছে। তাহাকে তুলিয়া তার মায়ের ঘরে পাঠাইবার আর প্রয়োজন হইল না দেখিয়া সে মেঝের একটা সতরঞ্চ পাতিতে পাতিতে স্বামীকে বলিল—"শুভাই আজ আমাকে রক্ষা করেছে। আমি সেই জন্ম ওকে আশীর্ব্বাদ করেছি,—তোর সোয়ামী যেন মুখ্‌খু হয়। মুখ্‌খু সোয়ামী যদি তোমার মত ব্যবহার করে, তা হ'লে মুখ্‌খু ব'লে তার আচরণ হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে। তোমাদের বেলায় যে মনকে প্রবোধ দেবার কিছু নেই। নাও, তোমার প্রাণপ্রিয়া চিঠিতে কি লিখেছে পড় আমি ব'সে ব'সে শুনি।"

"ও কি লিখেছে না পড়েই আমি জেনেছি। পড়তে হয় তুমিই পড়। আমি শুয়ে পড়ি" বলিয়াই চিঠিখানি নির্ম্মলার একরূপ পায়ের উপরেই ফেলিয়া ব্রজেন্দ্র বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

(৩০)

নির্ম্মলা চিঠি পড়িল। একবার—পড়িতে পড়িতে শিহরিল। দুইবার—পড়িতে পড়িতে ধ্যানস্থার মত মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু মুদিত হইল। তিন-বার—পড়িবার উদ্যমে বার বার চোখে জল সঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে পড়া শেষ করিতে দিল না।

"ঘুমলে নাকি গো ?"

"না।"

"কি ভাবছ ?"

"ভাবছি, রাত থাকতে থাকতে যে কোনও রকমে সেখানে একবার যাওয়াটা আমার উচিত ছিল। হাতেনাতে হারামজাদীকে ধরতে পারলেই সুবিধে হ'ত। এর পরে সে কতরকমের ভান করবে, কত দিব্যি গালবে—"

"হাতেনাতে কেমন ক'রে ধরতে ?"

"সে বামুনকে ঘরে ঢুকিয়েছে।"

"হেমা দেখেছে ?"

"দেখেইত সে পাগলের মত ছুটে এসে আমাকে খবর দিয়েছে।'

"হেমাকে দেখিয়ে সে বামুনকে সে ঘরে ঢুকিয়েছে নাকি ?"

"রাম রাম! তার বাবারও কি সে সাহস হয়! সে ওই চিঠি লিখে হেমার হাতদে আমাকে পাঠিয়েছিল।"

"বুদ্ধিমান হেমা চলে না এসে আড়ি পেতে পেতে দেখেছে-কেমন ?"

প্রশ্নটার অর্থ না বুঝিয়া ব্রজেন্দ্র উত্তর দিল না।

"তুমি মনে করেছ, চিঠি পেয়েই হেমা চলে এসেছে সে বিশ্বাস করেছে ?"

"কি রকম ? চিঠিতে সেই রকম কিছু সে লিখেছে নাকি ?"

"তুমিত না পড়েই চিঠির ভিতর কি লেখা আছে বুঝে নিয়েছ।"

ব্রজেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া নির্ম্মলার কাছে আসিল, না বসিয়াই বলিল—"কই চিঠিখানা দেখি।"

নির্ম্মলা চিঠিখানা মুঠার ভিতর পুরিয়া বলিল—"আগে বিদ্যের পরীক্ষা দাও।" ব্রজেন্দ্র তাহার হাত হইতে সেটা লইবার চেষ্টা করিতে সে আরো জোরে চিঠি চাপিয়া বলিল—"উহু, আগে বল—টেনোনা, ছিঁড়ে যাবে—তোমার বোন জেগে উঠবে—মা জানবে—সকাল হয়ে এলো—করকি—ছি!—"

"বেশ, ভিক্ষে দাও।"

"যা পার, আগে একটু বল—নইলে দেবো না।"

"তুমি কি মনে করছ, চিঠি প'ড়েই আমি তাকে খুন করতে ছুটবো ?"

"আমি কি মনে করছি তোমাকে বলব কেন! তুমি না প'ড়ে কেমন পণ্ডিত হয়েছ, আমি কেবল সেইটি জানতে চাই।"

কাজেই ব্রজেন্দ্রকে পত্নীর কাছে তার অনুমানের পরীক্ষা দিতে হইল।

"কি আর ছাই লিখবে! তোমার জন্য আশাপথ চেয়েছিলুম, দেরি দেখে ঘর বা'র করছিলুম, হেমার কাছে হঠাৎ তোমার জরের কথা শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়েগেছি। আমার প্রাণের ভিতরে কিযে যাতনা হচ্ছে তা আর লিখে তোমাকে কি জানাবো—তোমার বিরহে সারারাত আমি ছট্‌ফট্ করতে রইলুম সকাল বেলা হেমাকে দিয়ে কেমন থাক, যদি লিখে না পাঠাও, তা হলে কিছুতেই আমার শান্তি হবে না জেনে রেখো—ইত্যাদি।"

"জর হয়েছে লিখে পাঠিয়েছিলে বুঝি ?"

"কি করি, অবস্থা বুঝে এক আধটা ওই রকম করতে হয়—ওকে আইনে মিথ্যা বলে না। সামান্য একটু উত্তেজনাতে শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী হয়, ডাক্তারী আইনে তাকেও জর বলে।"

"তা হলে শুভার মুখ্‌খু স্বামী হ'ক এ আশীর্ব্বাদ করে আমি অন্যায় করিনি? তা যা হো'ক, ও সব ত ফাঁকা কথা কইলে, বামুন সম্বন্ধে সে কি লিখেছে অনুমান কর দেখি।"

"পথে আসতে আসতে ঝড়ে পড়ে বামুন আশ্রয় চেয়েছে। কি করি—একে ঝড় তাতে বামুন—থাকতে না দিলে পাপ হয়"—নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে যোগ দিল—"তবে কিনা সে যে সেটা -তুমিত বুঝতেই পারছ—অন্ধকারে চিৎপুর রোড মনে করে—বোকা বামুন সেটা যে তোমার চারুমতির ঘর তা বুঝতে পারেনি"—"এইবারে চিঠিখানা দাও।"

নির্ম্মলা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্কের মত হইয়া গেল। ব্রজেন্দ্র সেটা বুঝিতে পারিল। সে দেখিল নির্ম্মলার চোখ দু'টা তার চোখের উপর পড়িতে আসিয়া হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া কোন্ শূন্যদেশের প্রান্তে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আপনার দিক দিয়া স্ত্রীর এই আকস্মিক শূন্য দৃষ্টির হিসাব করিতে গিয়া বলিল—"তোমার কি আমার কথার বিশ্বাস হল না নির্ম্মলা?" বলিয়া এখন শুধু তার মুক্ত করপত্রের উপর অযত্নে পতিতবৎ পত্রখানাকে তুলিয়া লইল।

"ভয় নেই আমাকে বিশ্বাস কর।"

"তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারলেও, ভয় আমার ঘুচে গেছে।"

"শুধু তোমার জন্য নয় নির্ম্মলা তোমার সেই অসম্ভব রাগ দেখে পুঁটি কেঁদে উঠলো, কিন্তু নালু চুপ ক'রে কাতর নেত্রে যখন আমার মুখের পানে চাইলে, লজ্জায় ম'রে যাওয়া ব'লে সত্য সত্যই যদি একটা ব্যাপার থাকে, সেই সময় ঠিক যেন আমার তাই হয়েছিল। ছেলে বড় হয়ে উঠলো, বিশ্বাস কর, আর আমার এ রকম লজ্জার ব্যবহার চলবে না। যখন বেরুতে সুবিধা পেয়েছি তখন তার ফাঁদে আর পা দিচ্ছিনি।"

"তা হলে আর ও চিঠি পড়ে কাজ নেই।" বলিয়া নির্ম্মলা চিঠিখানা আবার ধরিল।

"একবার চোখ বুলিয়ে যাব মাত্র।" বলিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যেমন আলোর কাছে ধরিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা তাহার হাত ধরিয়া পড়িতে আবার নিষেধ করিল।

"এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"এখন থাক ছেলে মেয়ে উঠবার সময় হইল।"

"বেশ তুমি উঠে যাও না।"

"চিঠি তোমার নয়।"

"তবে কার?" বলিয়া চিঠি উল্‌টাইতেই ব্রজেন্দ্র দেখিতে পাইল, শিরোনামায় লেখা শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী, সাবিত্রী চরিতাসু।

এমন চমকিত বুঝি ব্রজেন্দ্র জীবনে হয় নাই। পত্রহাতে ধরিয়া সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"হেমা কি এই চিঠি হাতে ক'রে এনেছে?"

"তা আমি কি করে জানবো? সে তুমি জান।"

"তবে পড়বো না নাকি?"

"সত্যি সত্যিই মেয়েটা উস্‌খুস্ করছে—পড়তে চাও হাত মুখ ধুয়ে এর পর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে প'ড়। চিঠি তোমারই—শিরোনামাটা কেবল আমার।" পুঁটি বার দুই পাশমোড়া দিয়া ক্রন্দনের সুর ধরিবার উদ্যোগ করিল।

"আর বসে রইলে কেন—উঠে যাও না গো!"

ইহারই মধ্যে চিঠির উপর একবার মাত্র চোখ ফেলিয়াই ব্রজেন্দ্র দুই তিন ছত্র পড়িয়া লইয়াছে।

"আমার নমস্কার জানিবে। পত্র তোমার স্বামীকে লিখিতে গিয়া তোমায় লিখিলাম, অন্ধের চোখের উপর আলো ধরিয়া ফল কি?"

"অন্ধকে তবে আলো দেখাচ্ছ কেন নির্ম্মলা?"

"পড়েছ, তবে পড়—মাগী যেন নভেল লিখেছে।"

পত্র হাতে করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান

[শ্রীলীলা দেবী]

বাজিছে ডঙ্কা গিয়াছে শঙ্কা
চল্‌রে চল্‌রে মরণ মাঝ!
নাচিছে প'রাণ ঢুলিছে কৃপাণ
সেজেনে সেজেনে প্রলয় সাজ!
ঐ বাজে ভেরী আর নাহি দেরী
আয় রে ছুটিয়া বাহিরে আয়—
ছেড়ে দে' লজ্জা ভয়ের সজ্জা
সময় বৃথা যে বহিয়া যায়!
দ্যাখ্‌রে নয়নে মত্ত পবনে
উড়িছে মুক্তি-পতাকা দল,
বজ্র তাড়নে ছেদিয়া বাঁধনে
মুক্ত হবি তো চল্‌ রে চল্‌!
ঐ দ্যাখ কিবা গৌরব বিভা
অম্বরভালে উদিত আজ,
বাজিছে ডঙ্কা গিয়াছে শঙ্কা
সেজেনে' সেজেনে' প্রলয় সাজ!

সঙ্গীত

[শ্রীমহেশচন্দ্র সেন]

সেতার ও এস্রাজের স্বর-তরঙ্গ, নিশীথে বংশীধ্বনি, অথবা কোকিলের-কল-কূজন বা ভ্রমর-গুঞ্জনে অর্থযুক্ত বাক্য নাই, তথাপি তাহা হৃদয়োন্মাদক। বালকের অস্ফুট বাক্য কামিনী কণ্ঠ-স্বরলহরী স্বতই মনোমোহকর। যে কথা সামান্যতঃ বলিলে কোনরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না, কণ্ঠ-ভঙ্গীর গুণে তাহাতে প্রেম বিরহ, ভক্তি, বাৎসল্য ও শোক প্রভৃতি ভাব শতগুণে বিকশিত হইয়া

পড়ে। হৃদয়ের যে গভীরতম শোক, অপরিমেয় ভালবাসা, মর্ম্মান্তিক বেদনা ও অতলস্পর্শী প্রেম,—যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না,—সঙ্গীতের স্বর-মাধুর্য্যে কণ্ঠভঙ্গীর গুণে সেই ভাব পরিব্যক্ত হয়। দুঃখ যত গভীর তত বাক্যের অতীত। বাক্য সীমাবদ্ধ অথবা অসম্পূর্ণ। উদ্বেলিত হৃদয়-সমুদ্রের তরঙ্গ অপূর্ণ ভাষায় ধারণা করিতে পারে না;—তাহা ব্যক্ত হয় স্বর-ভঙ্গীতে। বস্তুতঃ স্বর যেন তাপিত অন্তরের একমাত্র ভাষা। পুত্র-শোকাতুরা জননীর বিলাপ ও পতি-শোক-বিবশা-বিধবার কান্না, হৃদয়-বিদারক! সে করুণ বিলাপে বাক্যসংযোগ না থাকিলেও মর্ম্মভেদিস্বরে অঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃদয়কে আলোড়ন করে, শোক, ভয় ও বিস্ময়ের ভাব নয়নাশ্রুরূপে ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। ফলতঃ হৃদয়ের গূঢ়-তল-চারী ভাব প্রকাশের ভাষা আবেগপূর্ণ স্বরভঙ্গী।

এই স্বর-বৈচিত্রের চরমোৎকর্যই সঙ্গীত। যে সঙ্গীতের বিমোহিনী শক্তিতে জগৎ মন্ত্রমুগ্ধ, যাহার উন্মাদকর বিহ্বলতা মদিরা অপেক্ষাও মত্ততাজনক; সেই সঙ্গীতের মূল উপাদান দুইটী;—শব্দ-চাতুর্য্য ও স্বর-চাতুর্য্য। অর্থযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যই শব্দ চাতুর্য্যের মূল; সুরের নাদ লয় এবং শ্রুতি ও মূর্চ্ছনাদিই স্বরচাতুর্য্যের প্রাণ।

নাদ বা ধ্বনি দ্বিবিধ, বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। মনুষ্যাদির কণ্ঠ হইতে যে নাদ নির্গত হয়, তাহা বর্ণাত্মক এবং বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে নাদ জন্মে, তাহা ধ্বন্যাত্মক বলিয়া কথিত। ধ্বনির অপর নাম কাকলী। মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি কল, গম্ভীর ধ্বনি মন্দ্র এবং উচ্চধ্বনি নাম তার। মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনিকে স্বর বলে। ঐ স্বর সা, রি, গা, মা, ইত্যাদি স্বর গ্রামে পরিণত হইলে সুর বুঝায়। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় স্বর বিভাগের নাম গ্রাম। উদারা গ্রাম, মুদারা গ্রাম ও তারা গ্রাম। এবং সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সপ্তস্বর।* সুতরাং সপ্তস্বর ও তিন গ্রাম স্বরগ্রামের মূল ভিত্তি। প্রত্যেক গ্রামে ৭টী সুর এক এক সপ্তক বলিয়া কথিত। মানব কণ্ঠে উদারা, মুদারা, তারা, এই তিন গ্রামের অধিক সুর উচ্চারিত হয় না। স্বর একটু উচ্চগ্রামে উঠিলেই কড়ি, এক পরদা নামিলেই কোমল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যম বলে। সঙ্গীতের ভাষায় ইহার নাম তারা, উদারা, মুদারা। এবং বেদান্ত মতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিতনামে অভিহিত। সা, রি, গা, মা, অর্থাৎ নিম্ন সুর হইতে উচ্চ সুরে উত্থানের নাম আরোহণ এবং নি, ধা, পা অর্থাৎ উচ্চ সুর হইতে নিম্নসুরে

* ইংরাজী ও ইয়োরোপীয় ভাষায়, ডো, রি, মা, ফা, সো, লা, সি সপ্তস্বর বলিয়া কথিত।

নামিবার নাম অবরোহণ। বিশুদ্ধ ভাষায় ইহাকে অনুলোম ও বিলোম বলে। এক সুরকে দ্রুত গতিতে বার বার কম্পিত করার নাম কম্পন। কোন স্বর হইতে এক বা ততোধিক সুরে অবিচ্ছেদ গতির নাম মূর্চ্ছনা। এক স্বরকে ভিত্তি করিয়া তাহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী স্বরের সহিত দ্রুত গতিতে বার বার ধ্বনিত করার নাম গমক। সঙ্গীতের ভাষায় কোন একটী অক্ষরকে দুই বা ততোধিক স্বর উচ্চারণের নাম আঁশ। কতকগুলি স্বর দ্রুত গতিতে আঁশ সহকারে আরোহণ করিলে অথবা ঐ দুইটী ক্রমকে মিশাইলে গিটকারী হয়। সা, রি, গা, মা, ইত্যাদি সুরের সাহায্যে অনুলোম ও বিলোম গতি দ্বারা গমক ও মূর্চ্ছনা সহকারে রাগ রাগিণী বিস্তার করার নাম তান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তানকে উপজ বলে। সুরের পরিমাণের নাম ওজন। কোনরূপ শব্দ অবলম্বনে ে স্পষ্টরূপে রাগরাগিণী প্রদর্শন করাকে আলাপ বলে। আলাপে গমক, মূর্চ্ছনা, গিটকারী প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাগিণী আলাপে প্রথম শ্লথ অর্থাৎ ঢিমা, পরে উহা দ্বিগুণ অর্থাৎ দুন, তৎপর চতুর্গুণ অর্থাৎ পর দুন এইরূপ গতি হইয়া থাকে। কতকগুলি স্বর গমক মূর্চ্ছনা ও গিটকারী সংযোগে আরোহী ও অবরোহী ক্রমে স্বরভঙ্গী দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া এক একটী রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে কমনীয়তার ভাগ অল্প তাহা রাগ; যাহাতে উহার আধিক্য, তাহাকে রাগিণী বলে। সংগীত শাস্ত্রে ছয় রাগ * ও ছত্রিশ রাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ সমস্ত যোগে ষোড়শ সহস্র উপরাগ ও উপরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বর-গ্রাম রাগ রাগিণীর মূল ভিত্তি। উহার মৌলিকতা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ স্থির করিয়াছেন যে, "ষড়্‌জ ময়ূরের কে-কা বা ভ্রমর গুঞ্জন হইতে উৎপন্ন। ঋষভ অর্থাৎ বৃষের ধ্বনি হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া কথিত। ছাগলের স্বর হইতে গান্ধার এবং শৃগালের রব হইতে মধ্যম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চম কোকিলের স্বর হইতে সৃষ্ট। ধৈবত অশ্বরব হইতে এবং মতান্তরে ভেকের স্বর হইতে গৃহীত। নিষাদ বা নিখাদ গর্দ্দভের ধ্বনি হইতে কাহারও মতে হস্তিস্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।' † এইরূপে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম ধৈবত, নিখাদ প্রভৃতি সপ্তস্বরের সৃষ্টি। মূল উনপঞ্চাশটী

---

* ভৈরব, মেঘ, পঞ্চম, শ্রী, নটনারায়ণ ও বসন্ত। এই ছয় রাগ যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়, ঋতুতে গীত হইয়া থাকে।

† ধ্বনি ও স্বর-প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত। বিশ্ব-সঙ্গীত।

বর্ণমালার সংযোগে যেরূপ ভাষার উৎপত্তি, শুদ্ধ শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সেইরূপ পশুপক্ষীর স্বরের অনুকরণে যে কিরূপে রাগরাগিণীর কল্পনা সূচিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

রাগরাগিণী শব্দময় সুরের সমষ্টি মাত্র। উহার সূক্ষ্মতম বিভাগগুলি এরূপ নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের সম্পূর্ণ অতীত। সঙ্গীতে ভক্তি প্রেম বা শোকব্যঞ্জক পৃথক পৃথক রাগিণী নির্দ্দিষ্ট আছে। বেহাগ রাগিণীতে হৃদয়ের ঔদাস্য ভাব আনিয়া দেয়। বিরহের অনুরূপ ললিত, এবং জয়জয়ন্তীতে শোকের তরঙ্গ উচ্ছ্বাসিত হয়। কাব্য নবরসাত্মক, কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত রসের প্রস্রবণস্বরূপ। রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ আছে। দিবসে, নিশীথে সন্ধ্যায়, কোন সময়ে কোন রাগিণীর আলাপচারি করিতে হয়, তাহাও প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে! দিনে বেহাগ গাইতে হয় না; রাত্রে ভৈরবী গাওয়া নিষিদ্ধ; অন্যান্য রাগরাগিণীর সম্বন্ধে এইরূপ। পূর্ব্বকালে রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেন। মেঘমল্লার বারিবর্ষণ ও দীপক রাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। ইহা অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইলেও প্রকৃষ্টতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। সুতরাং সেকালে রাগরাগিণীর চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে।

এক একটী রাগিণী এক একটী মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ। রাগ রাগিণী ধ্যান আছে; যে রাগিণীতে যেরূপ মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস জন্মে, সেই রাগিণীর প্রতিমাকল্পনাও তদুপযোগী, সন্দেহ নাই। ইহা অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। নব রসের মধ্যে আদি, করুণ ও শান্তি রস সঙ্গীতের পক্ষে অধিক উপযোগী; সুতরাং অধিকাংশ রাগ রাগিণীই ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক।

রাগ রাগিণীর ন্যায় তালও সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রা সমষ্টির নাম তাল। সঙ্গীতের কালকে করতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে সমভাগে বিভক্ত করা হয়; উল্লিখিত বিভাগ গুলিই মাত্রা। মাত্রা ভেদ অনুসারে তালের গুরুত্ব লঘুত্ব পিরিমিত হয়। মাত্রা চারিপ্রকার;—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ও অণু। হ্রস্ব—এক মাত্রা; দীর্ঘ—দুই তিন বা ততোধিক মাত্রা; প্লুত-অর্দ্ধ এবং অণু—$\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ বা তাহা অপেক্ষাও অল্প মাত্রা। তাল চারি অংশে বিভক্ত; বিষম, সম, অতীত, ও অনাঘাত। যে স্থান হইতে তালের প্রথম উৎপত্তি, তাহা সম, তালের ঠিক মধ্যস্থলে বিষম, সম ও বিষমের মধ্যস্থলকে অতীত এবং বিষম ও

সমের মধ্যস্থলকে অনাঘাত বলে। প্রথম পদ বিষম, দ্বিতীয়ের নাম সম, তৃতীয় অতীত এবং চতুর্থ পদের নাম অনাঘাত বা ফাঁক্। এই চারি পদের সমষ্টির নাম তাল। তন্মধ্যে সম এবং ফাঁক্, এই দুইটাই তালের প্রধান অংশ। গীতের আদ্যোপান্ত কাল পরিমাণ তুল্য হওয়ার নাম লয়। তালের সাহায্যে লয় রক্ষা হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক সম এবং অনাঘাত প্রভৃতি ঠিক্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়িয়া থাকে। লয়ের গতি ত্রিবিধ। প্রথম বিলম্বিত, শ্লথ, ঠাঁ বা ঢিমা। দ্বিতীয় মধ্য এবং তৃতীয় দ্রুত অর্থাৎ জল্দ বা দুন। প্রথম মাত্রার ও তালের যেরূপ গতি, পরবর্ত্তী মাত্রা ও তালের সেইরূপ গতি হওয়া উচিত। সমগতির ব্যতিক্রমের নাম বেলয় বা তালকাটা। গায়ক ও বাদক উভয়ের সুবিধা অনুসারেই লয় স্থির করা উচিত। তাল-নিরূপক মেট্রোনোম (Metronome) যন্ত্রের সাহায্যে মাত্রা ও তাল সাধন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা। তাল বহুবিধ। ৬৪ তাল, অসংখ্য উপতাল, এবং রং পরং প্রভৃতি যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। ব্যাকরণ যে রূপ ভাষার অধিরোহিণী, তাল ও সঙ্গীতের পক্ষে তদ্রূপ। বেতালা গান কদাপি শ্রুতি-সুখকর অথবা শ্রোতব্য বলিয়া পরিগণিত হয় না।

গীত সমূহ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। যে সমস্ত গীত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ, তাহাই ধ্রুপদ। ইহা অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত। ধ্রুব পদ এই নাম হইতে ধ্রুপদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। খেয়াল শব্দের অর্থ স্বাধীনতা অর্থাৎ ইচ্ছামতে যাহার নিয়মচ্যুতি ঘটে, তাহাই খেয়াল। খেয়ালের তান্ উপজ প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছামত রাগিণী বিস্তার করা যাইতে পারে। স্ত্রী-কণ্ঠের উপযোগী অর্থাৎ প্রেম, বিরহ, মিলন ও পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি কোমল ও মধুর ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের নাম টপ্পা। ধ্রুপদ গুরুপাক ও কষ্টসাধ্য। খেয়ালে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ও টপ্পার মাধুর্য্য উভয়ই বিদ্যমান। টপ্পা কোমলতা ও মাধুর্য্যের আধার; সুতরাং উহাতে সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়। গীত সমূহ প্রধানতঃ চারি চরণে বিভক্ত হইয়া থাকে; আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। যে গানের ভিন্ন ভিন্ন চরণে বিভিন্ন তাল ব্যবহৃত হয়, তাহাকে তাল ফেরতা বলে। গীত এবং বাদ্য উভয়ের মধ্যে বাদ্য গীতের অনুগামী; সেই জন্য হিন্দুস্থানী গায়কেরা গীতকে সওয়ার এবং বাদ্যকে তাহার বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

স্বর-চাতুর্য্য যেরূপ সঙ্গীতের প্রাণ, শব্দ-চাতুর্য্যও সেইরূপ সঙ্গীতের প্রধান

উপাদান। অর্থযুক্ত বাক্যভিন্ন মানসিক ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মে না এবং ছন্দোবন্ধে গ্রথিত না হইলে তাহা চিত্তাকর্ষক হয়না ; সুতরাং শব্দ-চাতুর্য্য জন্য অর্থযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের প্রয়োজন। ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়াই কাব্যের সৃষ্টি। সঙ্গীত স্বর-চাতুর্য্য ও শব্দ-চাতুর্য্যময়। সুতরাং কবিত্ব সম্বন্ধে কাব্য ও সঙ্গীত অভিন্ন ভাবাপন্ন। তান-লয়-নিবদ্ধ কবিতাই সঙ্গীত-পদবাচ্য। কবিত্ব-বিরহিত অর্থাৎ ভাব-বিহীন সঙ্গীত রসলেশ শূন্য ; উহা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়না। সুতরাং যে সঙ্গীতে নব রসের কোন রস বিদ্যমান নাই, উহা কদাপি সঙ্গীত পদবাচ্য নহে। আধুনিক যাত্রা ও স্বদেশী সঙ্গীতের অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কাব্যের উদ্দেশ্য যেমন মানসিক সুখ, সঙ্গীতের উদ্দেশ্যও তাহাই ; তথাপি বিস্তর মাত্রাগত প্রভেদ আছে। তান-লয়-নিবদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে মানবহৃদয় যে ভাবের তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়, উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠে কবি ও ভাবুক ভিন্ন অন্যের হৃদয়ে তাহার শতাংশের একাংশ ভাবও উদ্রিক্ত হয়না। অপিচ সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কাব্য পাঠে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া থাকেন ; —শোক, ভয়, বিস্ময় ও হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি ভাবে আত্মহারা হইয়া একবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ শিক্ষা প্রভাবে হৃদয় উন্নত না হইলে রসগ্রাহিতা শক্তি উন্মেষ হয় না ; এজন্যই কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যার আলোচনায় জনসাধারণের সহসা প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু সঙ্গীতানুরাগ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, ইতর ও সুরসিক, অরসিক, আপামর সাধারণ সকলেই সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তিতে বিমোহিত। সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণে হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হয়, আহ্লাদে নৃত্য করে, শোকে দ্রবীভূত হয় ও ভক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সঙ্গীতে অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়ন করে,—হৃদয়কে একবারে উন্মাদিত করিয়া তোলে। এই সর্ব্বজন-বিমোহিনী শক্তি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতার প্রধান উপাদান। সুতরাং কাব্য যদি মধু হয়, সঙ্গীত তবে মদিরা। ফল কথা, মাদকতা সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। মানবজাতির কথা দূরে থাকুক, অজ্ঞান পশুপক্ষীদিগকেও সঙ্গীতের সুমধুর তানে আত্ম-বিহ্বল হইতে দেখা যায়। বংশী-নিনাদ-মুগ্ধ বন-কুরঙ্গ নির্দ্দয় ব্যাধের শরে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, ইহা প্রবাদ বাক্য নহে। এই মুগ্ধকারিতাগুণেই ঈশ্বর-সাধনা পক্ষেও সঙ্গীত প্রধানতম অবলম্বন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠকল্প সাধকগণের মধ্যে অনেকেই

তাল-লয় নিবদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে সাধনমার্গ অনুসরণ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন। অপিচ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও সঙ্গীতের মহিমাকীর্ত্তনচ্ছলে ভাগীরথীর জন্ম প্রভৃতি বহুবিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অমোঘ নিদর্শন। বস্তুতঃ সঙ্গীতের ন্যায় এরূপ মোহমন্ত্র আর দ্বিতীয় সম্ভবে না।

উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্যও সঙ্গীত একমাত্র প্রধান সাধন। সঙ্গীতে নীচাশয়তা দূর করে, হৃদয় প্রশস্ত ও পরিমার্জ্জিত হয়, হিংসা, দ্বেষ, খলতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশ নিস্তেজ হইতে থাকে। সঙ্গীতামোদে মদিরার প্রমত্ততা আছে, অথচ কলুষপঙ্কিলতা নাই। কাব্য ও সঙ্গীত আলোচনার ফল একই—হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন।

রচনা—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে ;
আমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা আমার মা,
আমার পতি আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমায় যত্নের দেহ ভবে তাও রেখে যেতে হবে ;
আমার বলে' কারে ডাকি ?—চোখ বুজলে কেউ কারো না॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

তোড়ী-ভৈরবী—কার্ফা।

আস্থায়ী।

	২´	৩	॰	১	
II {	র্সা	র্সা। -া	র্সা। র্সা	-া। র্ঋা	র্সা I
	আ	মা র্	আ মা	র্ ব	লে'
	২´	৩	০		
I	মা	-পা। র্সা	-া। -া	-া। -া	-া I
	অ	• কি	• •	• •	•

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া । জ্ঞা -া । মা -া । জ্ঞা -মা I
আ • মা র্ এ • ও •

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া । ঋা -া । সা -া । -া -া }
আ • মা র্ ভা • • •

২´ ৩ ০ ১
I { পা পা । -া পা : । পা -া । দা পা I
তো মা র্ নি য়ে • তু মি

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -মা । পা -া । -া -া । -া -া I
থা • ক • • • • •

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া । জ্ঞা -া । মা -দা । জ্ঞা -মা I
নি • ও • না • ক •

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া । ঋা -া । সা -া । -া -া } II
আ • মা র্ মা • • •

অন্তরা ।

২´ ৩ ০ ১
II { দা -া । দা -া । দা -া । দা -পা I
(১) আ • মা র্ বা • ড়ী •
(৩) আ • মা র্ ছে • লে •

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া । র্সা -া । র্সা -া । র্সা -া I
(১ক) আ • মা র্ ভি • টে •
(৩ক) আ • মা র্ মে • য়ে •

২ ৩ ০ ১
I র্ঋা -া । র্ঋা -া । র্ঋা -া । র্ঋা -র্সা I
(১খ) আ • মা র্ ঘা • ভা •
(৩খ) আ • মা র্ বা • বা •

	২´	৩	০	১	
	I পা	পা। জ্ঞা	ঋ´া। স´া	-া। -া	-া } I
(১গ)	ব	ড় ই	মি ঠে	০ ০	০
	পা	-া। পজ্ঞ´া	-ঋ´া।		
(৩গ)	আ	০ মা০	র্ মা	০ -০	০

	২´	৩	০	১	
	I { স´া	-া। স´া	-া। ঋ´া	-া। স´া	-া I
(২)	আ	০ মা	র্ নি	০ য়ে	০
(৪)	আ	০ মা	র্ প	০ তি	০

	২´	৩	০	১	
	I পা	পা। -া	দা। পা	-া। -া	-া I
(২ক)	কা	ড়া ০	কা ড়ি	০ ০	০
	পা	-া। পা	-া। দা	-া। পা	-া I
(৪ক)	আ	০ মা	র্ প	ত্ নী	০

	২´	৩	০	১	
	I জ্ঞা	-া। জ্ঞা	-া। মা	-দা। জ্ঞা	-মা I
(২খ)	আ	০ মা	র্ নি	০ য়ে	০
(৪খ)	স	ঙ্ গে	ত কে	০ উ	০

	২´	৩	০	১	
	I জ্ঞা	-া। ঋা	-া। সা	-া। -া	-া } I
(২গ)	ভা	০ ব	০ না	০ ০	০
(৪গ)	যা	০ বে	০ না	০ ০	০

	২´	৩	০	১	
	I { দা	-া। দা	-া। দা	-া। দা	পা I
	আ	০ মা	র্ য	ত নে	র

	২´	৩	০	১	
	I স´া	-া। স´া	-া। -া	-া। স´া	সা I
	দে	০ হ	০ ০	০ ভ	বে

	২´	৩	০	১	
	I জ্ঞ´া	জ্ঞ´া। -া	জ্ঞ´া। ঋ´া	-া। ঋ´া	সা I
	তা	ও ০	রে খে	০ যে	তে

২´	৩	০	১	
I র্ণা	-র্সা । র্ঋা	-া । -া	-া । -া	-া } I
হ	০ বে	০ ০	০ ০	০
২´	৩	০	১	
I { র্সা	-া । র্সা	-া । র্সা	র্ঋা । র্সা	-া I
আ	০ মা	র্ ব	০ লে’	০
২´	৩	০	১	
I ণা	ণা । -া	দা । পা	-া । -া	-া I
কা	রে ০	ডা কি	০ ০	০
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া । জ্ঞা	-া । মা	-দা । ঋা	মা I
চো	খ্ বু	জ্ লে	০ কে	উ
২´	৩	০	১	
I জ্ঞা	-া । ঋা	-া । সা	-া । -া	-া } II II
কা	০ রো	০ না	০ ০	০

মন্তব্য।

"গান" পুস্তকে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় এ গানটির শিরোনামায় লিখেছেন—"ভৈরবী—কাওয়ালী"। অর্থাৎ ঐ পুস্তকানুযায়িক গানটি শুধু ভৈরবী সুরে গেয়। খুব সম্ভব দিলীপ বাবু তাঁর পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর মহাশয়ের খাস সুরের নামটি-ই লিপি করে রেখেছেন। গান খানির বহুল প্রচলিত সুর কিন্তু "তোড়ী-ভৈরবী"। লোক-প্রবাদ যে গান খানি অভিনয় বিশেষে (কোন পালার নিমিত্ত জানি না) গীত হওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল। আর প্রায়ই দেখা যায় যে, যে গান বারকতক অভিনয় কালে যে সুরে গাওয়া হয়, সাধারণতঃ সে সুর এতই বেশী প্রচার হয়ে পড়ে, যে রচয়িতার যদি খাসের পৃথক সুর থাকে, সে খাস সুর অনেক সময়ে চাপা পড়ে যায়! এস্থলে হয় ত তাই ঘটেছে। যা'ই হ'ক, শুধু "ভৈরবী"র পরিবর্ত্তে "তোড়ী-ভৈরবী" হ'লে তত কিছু এসে যায় না; কারণ "ভৈরবী" এবং "তোড়ী"—দুটি-ই "ভৈরব" রাগের আদি রাগিণী বলে সমধিক পরিচিতা; যদিচ পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদও দেখা যায়। যথা, ব্রহ্মার মতে "তোড়ী"

বসন্তের, ভারতের মতে মালকৌষের এবং হনুমন্ত মতে মালবের ভার্য্যা বলে কল্পিতা হয়েছে। "ভৈরবী"র কপালটা বোধ হয় মন্দ নয়, কারণ তার ভৈরব রাগের পত্নীত্ব সম্বন্ধে সকলের মত এক-ই। মতের ঐক্য দৃষ্ট না হলেও এ কথা নির্ব্বিঘ্নে বলা চলে যে, ও ছুটি বিভিন্ন রাগিণীর সম্মিলনে করুণ ও আদ্যরসের মিশ্রণ কে যত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, শুধু ভৈরবীতে সেটি সম্ভব হ'ত না।

তাল সম্বন্ধেও ঐ অভিনয় বিষয়ক যুক্তি কতকটা খাটে। অভিনয়-মঞ্চাদিতে কার্ফা, কাহারবা, দাদরা, খেম্‌টা, ছেপকা, ভরতঙ্গা ইত্যাদি ইত্যাদি তালেরই প্রভাব স্বভাবতঃ বেশী। তাই হয়ত কাওয়ালীর পরিবর্ত্তে কার্ফা তালেই গানখানি গীত হ'তে শোনা যায়। আমার কিন্তু মনে নেয় যে কার্ফা অপেক্ষা ঢিমে-কাওয়ালী তালে গাইলে, গানখানির গাম্ভীর্য্য কতক পরিমাণে হয় ত বজায় থাকৃতে পারত; কিম্বা ত্রিতালীর মধ্যগতিতে গাইলে আরও মজ্‌তে পারত!

যাই হ'ক, শাস্ত্রের একটি বোল্ ভেঙ্গে, সেটিকে "সাধারণো যেন গতঃ স পন্থাঃ" তে পরিণত করে, আর সেটিকে মহাবাক্য বলে অবলম্বন ক'রে, গানখানির যে সুর ও তাল অংশতঃ বেশী প্রচলিত, সেই সুরে ও তালে স্বরলিপি করলাম। বাঙ্গলা গান কিন্তু কার্ফা তালে বেশী গীত হ'তে শোনা যায় না। "কার্ফা"র যায়গায় "কাহারবা" তালই বাঙ্গলা গানে ব্যবহার করা হয়, যখন "কার্ফা'র আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ এই যে কার্ফা ও কাহারবার ঘর একই, কেবল তালাঘাতের নিয়ম কিকিৎ বিভিন্ন, যথা :—

"কাহারবা"র বোল—

২´ ৩ ০ ১
I ধাগ্ তেটে। নাক্ ধিন্। তাগ্ তেটে। নাক্ ধিন্ I

এবং কার্ফা'র বোল—

২´ ৩ ০ ১
I খে নে। না তে। নে তে। না -ক্ I

যেমন এক পরিবারস্থ জলদ্-তেতালা, কাওয়ালী আর ঠুংরীর মধ্যে, কিম্বা একই ঘরের দাদরার মধ্যেও ভরতঙ্গার ঠেকার, তফাৎ দেখা যায়। লেখিকা।

নারায়ণের নিকষমণি—

মেবার ১ম খণ্ড।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এ প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান—ইউনিয়ন বুরো, ১০নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মূল্য। আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি শিশু-ইতিহাস সাহিত্য গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। স্বাধীনতার চির উপাসক রাজপুত জাতির ইতিহাসের সহিত আমাদের বালকগণকে পরিচিত করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক এই পুস্তকখানিতে দুইটি অধ্যায়ে রাজপুতানার অতি প্রাচীনকাল হইতে আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস পর্য্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা সরল ও শিশুদিগের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভারত ললনা—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৬ নং বেচারামের দেউড়ী, ঢাকা। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের নাম বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। "ভারত ললনা" গ্রন্থে সাতটি বিভাগে সপ্তবিংশতি ভারত ললনার জীবন কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। "পঞ্চথেরী" বিভাগে বৌদ্ধযুগের পাঁচটি নারী চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। "ত্রয়ী" নামক বিভাগটি রুক্মাবতী, খনা ও লীলাবতী, জয়ন্তী এই কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। দ্বাদশ নারী অধ্যায়ে দ্বাদশ রাজপুত রাণীর চরিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কর্ম্মদেবী, রাণীভবানী, অহল্যাবাই ও লক্ষ্মীবাই এই চারিটি চরিত্রের আলোচনা বিশদভাবে করা হইয়াছে, অন্যান্য চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই, কারণ ইতিহাসকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিতে রামপ্রাণ বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা।

রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম, কনখল, হরিদ্বার।—আমরা এই আশ্রমের বিংশবাৎসরিক বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। নর-নারায়ণের সেবা এই আশ্রমের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থেই আশ্রমের সেবকগণ এই মহৎব্রত উদ্‌যাপনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তিনটি অভাবে সেবকগণ বিশেষ বিব্রত। (১) একটি আউট্ ডোর ডিস্পেন্সারির প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে এবং তদুদ্দেশ্যে অর্থও সংগৃহীত হইতেছে কিন্তু আনুমানিক ব্যয় ১৭০০০৲ টাকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১০০০০৲ টাকা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এক একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ১৫০০৲

লাগিবে, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি কোনও আত্মীয়জনের স্মৃতি রক্ষার্থ এক কিম্বা ততোধিক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহেন তাহা হইলে একটি মহদুদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সহায়তা করা হয়। (২) একটি স্থায়ী ফণ্ড্ না করাতে আশ্রমের বয়্যাদি নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আশ্রমে ৬৬টি জন রোগী থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে, মাসে প্রতিরোগীর জন্য ১৫৲ আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে সেবাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্তরূপ আয়ের কোন ব্যবস্থা করিয়া নর-নারায়ণের সেবায় ধন্য হইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এ অতিউত্তম সুযোগ। (৩) প্রতিবৎসর রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঔষধাদির দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ সেবকগণ অর্থের বিশেষ অভাব বোধ করিতেছেন। আশ্রমের সেবার জন্য তাঁহারা সহৃদয় মহোদয়গণের কৃপাভিক্ষা করেন।

রামকৃষ্ণ মনঃশিক্ষা—মূল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থান—৫২।২।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। এই পুস্তকখানিতে অতি সরল ও সুন্দর কবিতায় ভগবান রামকৃষ্ণের—জ্ঞানভক্তি ও কর্ম্মযোগের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। পরম-হংসদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী ভক্ত অন্নদাঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্নদাঠাকুর একজন উচ্চকোটির সাধক ও ভক্ত। এই পুস্তকপাঠে পরমহংসদেব প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ জন্মে।

ভাগ্যলেখা লাল৷ গোলকচাঁদ- ভিখারী নীরানন্দ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। সম্পত্তির লোভে মানুষ কিরূপ অন্ধ হয় এই পুস্তকে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা মন্দ নহে কিন্তু ঘটনা বিশেষকে উপলক্ষ করিয়া উপদেশ দিবার ভাষাটি স্থানে স্থানে বড়ই বিসদৃশ লাগিল।

স্বরাজ সঙ্গীত, প্রথম খণ্ড—প্রকাশক এন, কে, দাস, ২১ নং ভবানীদত্তের লেন, কলিকাতা, মূল্য ৵০ মাত্র। পুস্তিকাখানি ১৯টি গানের সমষ্টি, কয়েকটি গান আমাদের বেশ ভাল লাগিল।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব—শ্রীযুত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত হিন্দু-সমাজ পত্র "ত্রিশূল" হইতে উদ্ধৃত। পুস্তকখানি নিষ্ঠাবান হিন্দুগণের আদরের সামগ্রী হইবে।

দেশের ডাক - শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সরস্বতী লাইব্রেরী—৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মূল্য ৵১০ মাত্র। এই পুস্তকখানি গ্রন্থকারের পাবনা ও সিরাজগঞ্জের কয়েকটি বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত সারাংশ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থকার নিজের প্রাণে দেশের ডাকের যে সাড়া পাইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিয়া দেশের কার্য্যে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করি "দেশের ডাক" দেশবাসীমাত্রেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিবে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] [মাঘ, ১৩২৮।

বন্দী-বন্দনা

[হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

মল্লার—তেওরা।

আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে!

ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে!
টুটেছে ভয় বাধা
স্বাধীন হিয়াতলে!

ঐ ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরুশিলা, হস্তে বন্ধন,
নয়নে ভাস্বর সত্য জ্যোতিশিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশকোটি আজি মানব কল্লোলে।

ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে—
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে।

আজি বন্দী-শালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছেরে উতল কলরোলে।

আজি কারার সারাদেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যেথা বন্দী-কারাগৃহ
সেথা কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর-দলে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভতলে !

আজি ধ্বনিছে দিগ্‌বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ঐ ভারত হোমশিখা জ্বলিল জয়টিকা
পরাতে ও কপালে।
সে কারা মুক্তি-কারা যেখানে ভৈরব-রুদ্র-শিখা জ্বলে।

কোরাস্ :—জয়হে বন্ধন-মৃত্যু শঙ্কাজয়ী !
মুক্তি-কামী জয় !
স্বাধীন চিত জয় ! জয় হে !!

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত্ব

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

আর্য্য-হিন্দু দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যতত্ত্বকে বিবেক-শাস্ত্র নামে আখ্যাত করিয়াছেন। আমরা ইংরাজীশিক্ষিত যাহাকে philosophy বা দর্শনশাস্ত্র বলি তাহাতেও এই মোক্ষ শাস্ত্রে কিছু প্রভেদ আছে। বিষয় ও উদ্দেশ্যভেদে এই নামান্তর। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান; জীবাত্মা জগৎ ও ঈশ্বর ইহাদের প্রকার প্রকরণ ও সম্বন্ধনির্ণয় হইল philosophyর বিচার্য্য বিষয়; ইহার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র জ্ঞান লাভ; এই জ্ঞানের জোর চরমফল বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতা বা জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তিসাধন। পক্ষান্তরে হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাপেক্ষা গভীরতর জীবাত্মা মাত্রেই ত্রিবিধ দুঃখে দুঃখী; এই দুঃখ নিবারণ করাই হিন্দুতত্ত্ববিদদের প্রধান কর্ত্তব্য; এ দুঃখ শীতাতপ বা ক্ষুধা তৃষ্ণা বা অন্নবস্ত্রাভাবের দুঃখের মত তুচ্ছ দুঃখ নহে। ইহা

আত্মার শান্তিহারক পরম দুঃখ। এই দুঃখের হাত হইতেই মুক্তি পাইবার জন্য মানবাত্মা ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। এবং ধর্ম্মবিহিত নানা কর্ম্মক্রিয়া কৃচ্ছ্র-সাধনের অনুষ্ঠান করে। ইহার ফল আধ্যাত্মিক শান্তি, peace, happiness, bliss.

হিন্দুদর্শনের উৎপত্তি এই মুক্তি বা শান্তি অন্বেষণ চেষ্টার ফল। আদি বিধান কপিল, মহর্ষি বাদরায়ন, পতঞ্জলি কনাদ, গৌতম, শাক্যসিংহ বুদ্ধ প্রভৃতি মহা মহা তত্ত্ববিৎরা যে সব মোক্ষশাস্ত্রের প্রচলন করিয়া যান তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল দুঃখ হইতে জীবকে মুক্তি দিবার ইচ্ছা। প্রধানতঃ দুঃখ-বাদই হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথা, মধ্যের কথা ও শেষের কথা। এইটাই পাশ্চত্য-দর্শন হইতে হিন্দুদর্শনের প্রধান ভেদলক্ষণ। কাজেই আমার মনে হইয়াছে এবং হইবার অনেক যোগ্য কারণ আছে যে ইংরাজী বিচার অনুসারে হিন্দুর দর্শন বুঝিবার চেষ্টা করিলে অনেক গোলমাল থাকিয়া যায়। হিন্দুদর্শনে যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত, প্রমাণিত ও যুক্তিসিদ্ধ তাহাই ইংরাজী দর্শনে প্রতিপাদ্য। হিন্দুদর্শনের মূল আলোচ্য যে দুঃখবাদ ও দুঃখমুক্তি তাহা পাশ্চাত্যদর্শনে অজ্ঞাত ও অগৃহীত। সুতরাং পাশ্চত্যদর্শনের পূর্ণসাদৃশ্য হিন্দুদর্শনে খুঁজিতে যাওয়া বা প্রায় সদৃশ-মতকে সেই ভাবে বুঝিতে যাওয়ায় অনেক স্থানে হিন্দুদর্শন তত্ত্ব অবোধ্য থাকিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরাই হিন্দুদর্শনকে ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষিতদের নিকট সুলভ করিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের ব্যাখ্যাপ্রণালী অনুসারে বুঝিতে গিয়া আমরা ইংরাজী-শিক্ষিতরা অনেকস্থলে ঠিক বুঝিতে পারি নাই; এমন সব দুর্বোধ্য গোলমাল থাকিয়া গিয়াছে যে ইংরাজী-দর্শন সংস্কার না ছাড়িলে হিন্দুদর্শনের সূক্ষ্মতত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না।

সাংখ্যদর্শন শাস্ত্র আলোচনাকালে আমার এইরূপ কয়েকটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। পশ্চিমে যে সব দ্বৈতবাদাত্মক দর্শনশাস্ত্র আছে তাহাদের অনুযায়ী করিয়া সাংখ্যের দ্বৈতবাদকে বুঝিতে গিয়া এমন সব গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে যে কোন মতে কোথাও তাহার সন্তোষকর ব্যাখ্যা পাইতেছি না।

কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমুলরের হিন্দু-দর্শন ইতিহাসের সাংখ্য পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া কয়েকটা ইঙ্গিৎ পাইয়াছি যাহাতে আমার পূর্ব্বসংশয় অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে এবং নিজে যে একটা মীমাংসা মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার সমর্থক উক্তি দেখিয়া মনে আশ্বাস ও ভরসা পাইয়াছি।

প্রথমে আমার ধারণাটি বলি:—আমার নানা যুক্তিযুক্ত কারণে মনে

হইয়াছে যে হিন্দুদর্শন শাস্ত্র বিশেষে সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগ পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র হইতে aim, scope ও treatment এই তিন বিষয়েই ভিন্ন। যে যে বিষয়ে মিল আছে তাহা জগৎ-তত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে মিল হইবার কথা। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র is a science of the ultimate principles of Being জীবাত্মা পরমাত্মা ও জগৎ ইহাদের অস্তিত্ব ও সম্বন্ধ বিচার পাশ্চত্যদর্শনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম হইতে ইহার ভেদ বিস্তর। পশ্চিমে ধর্ম্ম revealed তত্ত্ব, উহাতে বিশ্বাস জীবের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। উহা বিচার বিতর্কের মধ্যে নহে। ভারতবর্ষে দর্শনতত্ত্বে ও ধর্ম্মতত্ত্বে মূলতঃ ভেদ নাই। পরন্তু দর্শনের মীমাংসিত তত্ত্বের উপরই প্রচলিত ধর্ম্ম মতের ভিত্তি। পূজনীয় বটব্যাল মহাশয় বলেন দর্শনের সীমানায় বেদের (ধর্ম্মের) প্রবেশ অনধিকার দর্শন তাহার মতে শুদ্ধ Logic ও Dialecticএর জিনিস। বেদ অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ তত্ত্ব (revealed)। সুতরাং দর্শনের উচিৎনয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা ও বেদের উচিৎনয় দর্শনের প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করা। আমার মনে হয় এই ভেদ চেষ্টা ভুল। হিন্দুর দরর্শনশাস্ত্র যে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ভিন্ন নহে তাহার প্রধান প্রমান উহার নাম "মোক্ষশাস্ত্র"। ব্রহ্মপ্রাপ্তি কৈবল্যলাভ নির্ব্বাণলাভ এই সব কথায় বুঝা যায় দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে পরমপদ লাভ করান; যে পদ লাভ করিলে মানুষের সংসার গতাগতি শেষ হয়। ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রেরও কি উদ্দেশ্য নয়? পরন্তু দর্শনশাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্র না হইবে তবে দার্শনিকেরা শ্রুতিকে কেন এত মান্য করিয়াছেন? শ্রুতি সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের মহা আশ্রয়স্থল। সেই শ্রুতির অনুমোদন ও সম্মতিলাভের জন্য দার্শনিকদের এত চেষ্টা কেন?

মোট কথা হিন্দুর দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র। উহার শিক্ষনীয় বিষয় পরাবিদ্যা। পরাজ্ঞান পরমার্থজ্ঞান অপরাবিদ্যা ও অপরাজ্ঞান ইহা হইতে অনেক হীন। কেন না অপরাজ্ঞানে মোক্ষ পাওয়া যায় না; পরাজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান ও দর্শন-লব্ধ জ্ঞান আমাদের চোখে অপরাজ্ঞান। তবে গ্রীকদর্শনের দেয় জ্ঞান পরাজ্ঞানই বটে। বিশেষ Plato ও Neo-platonistদের দর্শনশাস্ত্র লব্ধ জ্ঞান বটে।

সর্ব্বশাস্ত্রের আদি যে উপনিষদ, তাহাতে দেখা যায় ঋষিরা সেই জ্ঞানের প্রয়াসী যাহা লাভ করিলে সমস্ত জানা যায়; যাহাতে সংসারবন্ধ মোচন হইয়া মুক্তি পাওয়া যায়; দর্শন যুগের পূর্ব্বে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও দেখা যায় মানুষ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তির জন্যই দেবদেবতার উপাসনায় ব্যস্ত।

যাগযজ্ঞের ফলে যে স্বর্গ লাভ হইবে সমস্তকাল সুখসম্ভোগ ঘটিবে ইহারই আশায় আশান্বিত হইয়া মানুষ কত না কি চেষ্টা করিতেছে।

দর্শনের যুগে দেখি সেই একই চেষ্টা অর্থাৎ কিসে জীব দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে? কি পথে গেলে আত্মা পরম শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু প্রশ্ন পুরাতন হইলেও সমস্যা মীমাংসা নূতন ধরণের—তত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মদর্শীরা অনেক অনুধাবন করিয়া জানিবেন, সব দুঃখের মূল হইতেছে **সংসার বন্ধন** এই যে সংসার মায়া ইহারই দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ইহারই মোহ মদিরায় উন্মত্ত হইয়া জীব আত্মানন্দ ভুলিয়া সুখ শান্তির জন্য ছুটাছুটী করিতেছে। জীব জানেনা যে যাহা সে খুঁজিতেছে তাহা বাহিরে নাই তাহা মৃগনাভির মত মৃগের শরীরেই আছে—এই সুখ শান্তি আত্মার স্বরূপ; ইহা আত্মাই আত্মাকে দিতে পারে; কোন দেব-দেবতা তাহা দিতে পারেন না। একমাত্র আছেন পুরুষ বা আত্মা; আর আছে জড় জগৎ; বা উভয়ে আছে ব্রহ্ম। তার মধ্যে জগৎ বা প্রকৃতি অনিত্য আত্মা নিত্য। (জীব) আত্মা নিজ স্বরূপ ভুল করিয়া শাশ্বত রত্ন এই শান্তিকে অনিত্য জগতে খুঁজিতেছে। এই যে বাহিরে খোঁজা এটা অবিদ্যা ভ্রম বা মায়া বা অবিবেকের কাজ। এই অবিদ্যা বা অবিবেক মাঝখানে থাকিয়া জগৎকে বা (বা ব্রহ্মকে) সংসারে পরিণত করিয়াছে। জগৎ স্ব স্বরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা মূলা প্রকৃতি; আত্মা (জীব) অবিদ্যা বা ভ্রমের একটা আবরণ দিয়া জগৎটাকে তার স্ব স্বরূপ হইতে বিকৃত করিয়া সংসার তৈয়ারী করিয়া তাহা হইতে সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মিথ্যা কথার মোহে ভুলিয়া ...অনন্ত সুখৈশ্বর্য্য লোভে স্বর্গ কামনায় নানা নিষ্ঠুরাচরণ করত যাগ যজ্ঞ করিয়া প্রতারক পুরোহিতদের স্বার্থ বাড়াইতেছে আর নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

তবেই দেখা যাইতেছে এই সংসারই সকল দুঃখের মূল। এবং এই দৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ "জীবজন্তু—বৃক্ষলতা-নদনদী—জীবজন্তু, ঘরদ্বার" প্রভৃতির সমষ্টীভূত এই যে জগৎ ইহাই জীবের ভাব-ভাবনা কামনা কল্পনায় রঙ্গীন হইয়া তাহার কাছে সংসারে পরিণত হইয়াছে। স্বরূপে জগৎ (যা ব্রহ্মের পরিণতাবস্থা সুতরাং সত্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাংশ বলিয়া) জীবের সুখদুঃখের হেতু হইতে পারেনা; কিরূপে অর্থাৎ বিকৃত হইয়া অর্থাৎ সংসাররূপ ধরিয়াই সে জীবের সকল দুঃখের হেতু হইয়াছে। কেন এমন হইল? কে জগৎকে এমন করিয়া বিকৃত করিয়া সংসার করিল? জীবের অবিবেকী অবিদ্যাগ্রস্ত আত্মা করিল। কেন? এই জীবধর্ম্ম এই যে সংসার-ঘটনা ইহা অনাদি জীবমায়ার

কাজ; যেখান হইতে জীব সেখান হইতেই এই সংসারঘটনী মায়া। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই এই পুরানী সংসার প্রবৃত্তি নিসৃত। কেন তিনি এই মায়া ঘটাইলেন? তাহার লীলা বা খেলা যাই বল। অথবা পুরুষ প্রকৃতির সহিত যুক্ত হওয়াতে ইহা হইয়াছে। কেন যুক্ত হইলেন? জানিনা, ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে দেখিতেছি। এ কোনর উত্তর নাই। দার্শনিক জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। তবে ইহা সত্য যে এই শক্তি এই মায়া, এই সংযোগ ক্ষণিক। ইহার শেষ আছে। ইহা অনাদি হইলেও সান্ত বটে। এখন জীব এই যে জগৎকে একটা ভ্রমাবরণে আবৃত করিয়া সংসার পরিণত করিয়া দুঃখ পাইতেছে ইহার নিরাস জীবের পক্ষে সম্ভব। কেননা দেখা যায় অনেক মুক্ত জীব এই মায়া কাটাইয়া নিজের ও জগতের সত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন ও পারিয়াছেন বুদ্ধ, চৈতন্য শুকদেব, যিশু, মহম্মদ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের এই সংসার সৃজনকারিনী মায়ার শেষ হইয়াছে। আমরা জগৎকে যে রঙ্গে রঙ্গীন দেখি তাঁহারা তাহা দেখেন না—

এখন দর্শনকারিরা বলেন যে দুঃখের মূল এই সংসারেব উচ্ছেদ করা যায়। এবং তৎফলে মুক্তিলাভ হয়। সকলেই বলিতেছেন জীব ও জগতের মধ্যস্থিত এই যে মায়াবরণ, যা অবিদ্যাজনিত বা অবিবেক ঘটিত তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ছিন্ন করা যায়। কিরূপে এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে তাহার পন্থা তাঁহারা নিজ নিজ প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রমত দ্বারা স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সকলেরই মূল কথা তাই, তবে পন্থা নির্দ্দেশ আলাদা। আসলে জীবের সহিত জগতের ও ঈশ্বরের ঠিক সম্বন্ধটা জানিতে হইবে। জগৎ আছে, জীবও আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, তবে স্বীকারের ধরণটা আলাদা। এই ধরণ লইয়া যত লাঠালাঠী! বেদান্ত বলেন ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই দুই বিধা; তাহারা দেশকাল কারণ বদ্ধ বলিয়া নিত্য সত্য নহে, ক্ষণিক সত্য। ব্রহ্মের তুলনায় মিথ্যা। বন্ধ্যার পুত্রের মত মিথ্যা নহে! এই যা। এই আছে এই নাই, এখন একরূপ পরে অন্যরূপ। যেন মায়ার খেলা, থাকিয়াও নাই, না থাকিয়াও আছে। বেদান্ত মতে জগৎ বা ব্রহ্ম সত্য তাহাদের বা তাহার বিকৃতরূপ এই সংসারটাই মিথ্যা।

যত গোল হইয়াছে এই জগৎ কথাটা লইয়া। আমার মনে হয় এবং প্রমাণও আছে মোক্ষপ্রচারক বেদান্তকার প্রপঞ্চ জৎগকে সংসার হইতে অন্তভাবে দেখেন নাই। কেননা জীবের চোখে জন্ম হইতেই জগৎটা বিকৃত

রূপেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই তাঁহারা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক কথার ব্যবহার দ্বারা জগৎ as it is ও জগৎ as it appears to ভ্রমদৃষ্টি এই দুই জগৎকে তফাৎ রাখিতে যত্ন করেন। বেদান্ত প্রতিবাদীরা এই কথাটা না মানিয়া তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। বেদান্তবাদী যে দৃশ্যমান এই বহুরূপী-জড়াজড়-জগৎটাকে উড়াইয়া দেন নাই তাহার সমর্থক লক্ষ উক্তি আছে। তাঁহারা সংসার বা ভ্রমজ বিকৃত জগৎটাকেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সাংখ্যকারও কি এই **সংসারকে** মিথ্যা বলেন না? যদি না সংসার মিথ্যা হইবে তবে পুরুষ মুক্ত হন কিরূপে? তাহার মতে অবিবেক ঘুচিলে পুরুষ প্রকৃতি প্রভাব হইতে ভিন্ন হইয়া স্বরূপে থাকিয়া যান। প্রকৃতিও **প্রপঞ্চ-জগৎ** নষ্ট হয় না। বেদান্তও বলেন অবিদ্যা ঘুচিলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত্তিত জগৎ থাকে; মোহ বা **কামকামনা বিকৃত জগৎ বা সংসারটাই** ঘুচিয়া যায়। কথাই তাই।

যত গোল এই **জগৎ** কথাটির ব্যবহার লইয়া বেদান্ত যেখানে জগৎ মিথ্যা বলিয়াছেন, বা স্বপ্ন বা মায়া বিজৃম্ভিত অলীক কল্পনা বলিয়াছেন সেখানে জগৎ মানেই **সংসার**। জীবের মমতা-ঘটিত হেয়-প্রেম সম্বন্ধ বিশিষ্ট জগৎটাই সংসার। ইহারই মিথ্যাত্ব বেদান্তের প্রতিপাদ্য। শংকরাচার্য্য তাহাই বলিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাহা মানেন না। মনে হয় আচার্য্য শংকর গোড়ায় এই **সংসার** ও **জগতের** ভিন্নার্থটা খোলসা করিয়া বলিলে এবং যথাস্থানে ঠিক কথা ব্যবহার করিলে এত গোল হইত না। অথচ গোল না হইবারই কথা। তিনি বৌদ্ধ কথিত অলীক বা শূন্যবাদ, জগতের চরম-মিথ্যাত্ব (absolute nihilism) নিরাস করিতে কতই না যুদ্ধ করিয়াছেন। স্থূলজগতের সৃষ্টি বুঝাইতে কতই পরিশ্রম না করিয়াছেন। মুক্ত পুরুষের আচার ব্যবহার ব্যাখ্যা কালে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে কোথাও মনে হয় না যে দিব্যজ্ঞানযুক্ত মুক্তাত্মার চোখে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত জীবজন্তু ঘটপট সব উবিয়া ফাঁকা হইয়া যায়! এমন কি তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে এই যে অজ্ঞানরচিত **সংসারটা** ইহাও একেবারে মিথ্যা নয়; ইহারও সত্ত্বা না মানিয়া চলা যায় না; মুক্ত হইলেও জীবের জীব-ধর্ম্ম আছে তো? **সমাজে বাস** করিতে হইলে তাহাকে সংসার সম্বন্ধ মানিয়া চলিতে হইবে। জীব-সমাজ থাকিলে সংসার থাকিবেই; মুক্ত পুরুষকে সেই সমাজে থাকিতে হইলে সংসারের বাছবিচার ভেদাভেদ মানিতে হইবেই; এইটাই সংসারের বা জগতের

ব্যবহারিক **সত্যতা** (worldly reality)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব তো মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা কি খাদ্যাখাদ্য , শত্রু মিত্র, ন্যায় অন্যায় ; সদসৎ ঘটপট পথঘাট ভেদাভেদ করিতেন না ? তবে তাঁরা জানিতেন যে এসব বিচার **ব্যবহারিক**, পারমার্থিক নয়। সমাজে পাঁচজন জ্ঞানী লোকের মধ্যে থাকিতে হইলে এ ভেদ অনিবার্য্য ; তবে তাঁহাদের সংসার-বাস আর সাধারণ অজ্ঞানীদের সংসার বাস উভয়ে ভেদ এই:যে,– তাঁহাদের চোখে **সংসার** মিথ্যা তবে ক্ষণিক সত্য এবং চরমকার্য্য নয়। সাধারণ অজ্ঞানীর চোখে সংসারই একমাত্র সত্য, নিত্য সত্য ও চরমকার্য্য। সাধারণ অজ্ঞানী দেহাত্মবাদী জ্ঞানী কিন্তু দেহ ও আত্মার সত্যভেদ, স্বতন্ত্র সত্বা, স্বীকার করেন। যেমন কাগজের নোটখানা অজ্ঞানীর চোখে দশটা টাকাই বটে, জ্ঞানীর চোখে সেখানা দশ টাকার symbol মাত্র ; উহার আসল মূল্য আজ আছে ; কাল নাই। সংসার সম্বন্ধটা তেমনি জ্ঞানীর চোখে একটা ক্ষণিক প্রয়োজনের symbol মাত্র ; অবস্থা বিশেষে উহার কোনোই সত্য নাই, মূল্য নাই ; অজ্ঞানীর চোখে সংসারই সার ও সর্ব্বস্ব, জগতই সংসার, সংসারই জগৎ ; উহাই কাম্য ও পরম সম্পত্তি ; উহাতেই সুখ ও শান্তি। উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অস্তিত্ব থাকিতে পারে না—ইত্যাদি।

এখন কথা – হইতেছে আর্য্য হিন্দু দর্শন যে মোক্ষ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন তাহার বিচার প্রণালী কিরূপ ? প্রণালীটা এই :—দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা জীবের পরমপুরুষার্থ—দুঃখ কোথা হইতে ? সংসার হইতে।—সংসার কি ?—জীবাত্মার সহিত বাহ্য জগতের হেয় প্রেয় সম্বন্ধ সৃজন। কে এ সৃজন করে ? জীবই ইহার সৃষ্টি কর্ত্তা ? কি করিয়া সৃষ্টি করিল ? অনাদি অজ্ঞেয় ভ্রম; অবিদ্যা অবিবেক বশতঃ।– কিসের ভ্রম ?—পুরুষ বা আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত ; দেহ, প্রকৃতি বা জগৎ তা হইতে স্বতন্ত্র, একের প্রভাব অপরকে বিকৃত করিতে পারে না, অথচ তাহাই করিয়াছে—প্রকৃতিও পুরুষের, জীব ও জগতের মধ্যে এই যে সত্য নিত্য সম্বন্ধ ইহা না জানাই এই অবিদ্যার স্বভাব। উপায় ?—বিবেক দ্বারা বা আত্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা এই ভ্রমকে উচ্ছেদ করা। করিলে কি হইবে ?—মুক্তি, মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ স্বস্বরূপে অবস্থান করা পরমা শান্তি বা আনন্দ আস্বাদ।

মুক্তের পক্ষে জগতের বা প্রকৃতির গতি কি হইবে ?—মুক্তের চক্ষে জগৎ অবিকৃতভাবে সংসার বিকৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপে থাকিবে প্রকৃতি

যেমন লীলা করিতেছে করিবে—পুরুষ উদাসীন দ্রষ্টা হইয়া কেবল বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিবেন।

আসল কথা বিবেকনেত্র খুলিলে জীবাত্মা তাহার lower nature হইতে ছাড়ান্ পাইয়া Higher natureএ অবস্থান করিবে।—স্বাদুফলভোগী চঞ্চল অস্থিরমতি রসপিপাসী পক্ষী অভোজনকারী, স্থির সংযত অকাম উর্দ্ধবিহারী পক্ষীর মত স্বারূপ্য লাভ করিবে। মুক্তের চিত্ত Higher lifeএ মগ্ন থাকিবে, lower natureএর কাজগুলি আপনাহাতে mechanically চলিয়া যাইবে।

এখন আমার কথা হইতেছে সাংখ্য শাস্ত্রে বিশদ আলোচনা দ্বারা মহর্ষি কপিল দেখাইতেছেন কেমন করিয়া প্রকৃতি পুরুষের অদৃষ্ট মিলনে সংসার সৃষ্টি হয়, এবং কি পন্থায় ভ্রমান্ধ কর্ম্মফলভোগী প্রকৃতিমুগ্ধ পুরুষ বিবেক লাভ করিয়া মুক্ত হয়। সর্ব্ব দুঃখের মুল সংসার যে কি অদ্ভুত উপায়ে সৃষ্ট হয় আবার নষ্ট হইতে পারে তাহাই কি বেদান্ত, কি উপনিষদ কি সাংখ্য, কি বৌদ্ধ দর্শন কি যোগ দর্শন সকলেই নির্ণয় করিতেছেন। বৌদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদ এই সংসার সৃষ্টিরই ব্যাখ্যা।

অনেকেই হিন্দু মোক্ষ শাস্ত্রকে পাশ্চাত্যদর্শনের পদ্ধতিতে বুঝিতে ও বুঝাইতে গিয়া বহু ভ্রমে পড়িয়াছেন। আধুনিক যত দেশী বিদেশী সাংখ্য ব্যাখ্যা পুস্তক সকলেতেই এই ভ্রম দেখা যায়। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষকে পাশ্চত্য matter ও force এর সঙ্গে একার্থবোধক করিয়া স্থুলজড় জগৎ সৃষ্টির অবতারণা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে দুইটী বিভিন্ন চিন্তাধারা বিপরীত-মুখী চিন্তাধারা এক গ্রন্থে এক শাস্ত্রে মিশিয়া খিচুড়ী হইয়াছে। বিশেষ দেখি সাংখ্যের। যে কেহ "তত্ত্বসমাস্" নামক সাংখ্য-সূত্র মন দিয়া আলোচনা করিবেন তিনিই দেখিবেন, আসলে কপিল দর্শন পাশ্চাত্য জড়াজড় দ্বৈত দর্শন হইতে অনেক পরিমাণে ভিন্ন। এমনকি ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত সাংখ্যকারিকা যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিচিত তাহাতেও দেখা যায়, এ শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য ত্রিবিধ দুঃখের হেতু জীব কর্ত্তৃক সংসার সৃষ্টি এবং মুক্তির পন্থাস্বরূপ সংসার বন্ধন ছেদন। এবং জীবাত্মার সহিত প্রকৃতির ভেদ বা বিবেক জ্ঞান এই বন্ধনচ্ছেদনের উপায়। matter ও force যোগে জড়জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের যে সৃষ্টি তাহা পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বটে, কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অন্য অর্থাৎ অবিবেক যোগে প্রকৃতিপুরুষের সত্যসম্বন্ধ না জানার ফলে সর্ব্বদুঃখকর সংসারের

সৃষ্টি; তবে জগৎটাই সংসাররূপে পরিণত হয় বলিয়া প্রয়োজনভাবে স্থূল-জড়জগতের কথা আসিয়া পড়ে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী আরম্ভ করিয়াছেন "অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্তঃ। তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্ দর্শনমাহ—"এ অধ্যায় সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যা সবাই জানেন। তৎরচিত হিন্দুদর্শন শাস্ত্র ইতিহাসে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর কৃত যে তত্ত্ব সমাসের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহার পাঠে এই মতটী দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়। অপি চ ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার সূত্রের বেশীভাগই সংসার সৃষ্টি ও সংসার মোচনের প্রকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি যে cosmic world এর স্থূলজগতের নয় তাহা সকলেই মানেন। কিন্তু মানিয়াও কেহ কেহ প্রকৃতি-পুরুষ ও সত্বাদি গুণত্রয়কে matter force এবং attraction repulsion inertia সংজ্ঞা দিয়া Cosmogenetic সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে সত্ব রজঃতম দ্রব্য নয় উহারা স্বভাব গুণ। তত্ত্বসমাসে একথাস্পষ্ট উল্লিখিত। সাংখ্যকারিকার বর্ণনাভাবেও তাই মনে হয়। আর একটা গোলমাল প্রকৃতি বা মূল প্রকৃতি সত্যই Primordial matter কি না।

সত্ব রজঃ তম এই তিনগুণের গুণত্ব (দ্রব্যত্ব নয়) গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। গীতাকার ত্রিগুণকে moral qualities বলেন। তত্ত্ব সমাস যাহা আসল কপিলশাস্ত্র বলিয়া প্রখ্যাত তাহাও ঐ কথা বলেন। প্রকৃতি বালতে জড় বিশ্বের মূল উপাদান কিনা বুঝা যায় না, তবে জীব প্রকৃতি প্রাক্তন সংস্কার ঘটিত heriditary human nature বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতির আসল মানেই তাই জীবের **স্বভাব** আদিতে অব্যক্ত থাকে, পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে Soul এর প্রভাবে ভাল মন্দ; পুণ্যাপুণ্য, উত্তমাধম গুণ যোগে বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয় এবং সেই গুণানুসারে পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বস্তুকে ইষ্টানিষ্ট বোধে কখনো হেয় কখনো প্রেয় কভু কাম্য কভু বা অকাম্য করিয়া **সংসার রচনা** করে। কোনো একটা **বস্তুতে** যে **ভাল মন্দ** গুণ লাগিয়া আছে তাহা নয়; অবস্থা বিশেষে একই বস্তু জীবের কাছে কখনো ভাল কখনো মন্দ যখন ভাল তখন কাম্য desirable যখন মন্দ তখন হেয় undersirable অন্যথায় indifferent neutral আবার এখন যাহা কাম্য, পরেই তাহা অকাম্য। বস্তুর এই স্বরূপ বিকৃতি কেন হয়? পুরুষ বা আত্মার

সান্নিধ্যবশতঃ। জীবধর্ম্মী আত্মা ; বহির্জগতের সম্বন্ধেই তার জীবত্ব ; সে এটা ওটা চাহিবে। যখন তার অস্তিত্বের পক্ষে যেটা প্রয়োজন তখন সেইটাই কাম্য। জগতের বস্তু মাত্রেই কামনাময় জীবের সম্মুখীন হইলেই হয় **প্রেয়** না হয় **হেয়** না হয় **উদাসীন**। গীতায় প্রকৃতিকে **ক্ষেত্র** বলা হইয়াছে ; পুরুষ বা আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র কথাটীর অর্থ প্রকৃতির আসল অর্থদ্যোতক। তমস্ আর একটী নাম। প্রকৃতি **তমস** বা 'অন্ধকার' কেন ? আসল-কথা হইতেছে জীবের শুদ্ধাত্মা জীবের inherent nature স্বভাব বা প্রকৃতি এই উভয়ের সম্মিলনই সংসার এবং তৎফলজাত সুখদুঃখাদির বন্ধন। এই স্বভাব inherent মানব প্রকৃতি বা nature, Soul বা আত্মার প্রভাবেই কাজ করে ; তা না হইলে পারে না ; অন্ধ জড়বৎ পড়িয়া থাকে। আত্মার আলো বা প্রভাব পড়াতেই এই জীবপ্রকৃতি বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদিতে ফুটিয়া ওঠে। মুলে, আদৌ এই প্রকৃতি তমোধর্ম্মী অর্থাৎ neutral unaffected ; আমার প্রভাবে বুদ্ধি অহংকার প্রভৃতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উহার এই neutral ভাব কাটিয়া যায়, উহা হয় **ভাল** (সত্ত্ব) না হয় **মন্দ** (রজ) ভাবে দেখা যায়। ইহাই সাম্যের ব্যতিক্রমাবস্থা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-ফলে কাহারও প্রকৃতি সাত্ত্বিক কাহারো বা রাজসিক ; কাহারো বা তামসিক ; এই যে জীব প্রকৃতির ত্রিধা ভাব ইহা অনাদি প্রবাহ। জীবের শৈশবে ইহা অব্যক্ত ভাবে থাকে। পরে তাহার বুদ্ধি ও অহংকার খুলিলে ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হইলে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি নিজ ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিলে তখন তাহার অব্যক্ত মূল প্রকৃতি, স্বভাবভেদে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক রূপে প্রকট হয় ; সে সংসারী হইতে থাকে। প্রকৃতি তাহাকে নিজ প্রভাবে কর্ম্ম করায় এবং পুরুষ রূপী সেই জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে। এই ভোগ ততক্ষণ যতক্ষণ সে নিজাত্মস্বরূপ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না দেখে। সংসারে জীবের এই দুঃখ কেন ? তার কারণ আত্মা (পুরুষ) দেহধর্ম্মী হইতে চায়, আর, দেহ আত্ম-ধর্ম্মী হইতে চায় বলিয়া। উভয়ে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, ভিন্নধর্ম্মী ; এই কথাটা জানিলে যে যার স্বভাবকর্ম্ম করে, স্বরূপে থাকে ; একে অপরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না ; জগৎ নিজ নিয়মে সরল ভাবে চলে ; কিন্তু সংসারী জীবে তাতো হয় না ; পুরুষ প্রকৃতিধর্ম্মী হয় অর্থাৎ পরিণামশীল হইতে চাহে, নৃত্য করে, ছুটা-ছুটী করে জলৌকার মত এটাতে ওটাতে নড়ানড়ি করে ; আর প্রকৃতি অচেতন হইয়া চেতন পুরুষের মত ভোগ করিতে চায় ; এই যে উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ

ভ্রমবশে পরস্পরের ধর্ম্ম-অবলম্বন করা **ইহাই সংসার সৃষ্টি,** ইহাই দুঃখের মূল।

তত্ত্ব সমাসের পঞ্চবিংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ভাল করিয়া পাঠ করিলে আগাগোড়া দেখা যায় এই ভাবে সংসার সৃষ্টির ব্যাখ্যাই আসল বক্তব্য। cosmic জগতের সৃষ্টি ব্যাখ্যা সাংখ্যের উদ্দেশ্যই নয়। এই সংসার তত্ত্বের কথাটার পাশ্চাত্য দর্শনে একেবারে স্থান নাই। কেন না পাশ্চাত্যদর্শন মোক্ষ বা বিবেক শাস্ত্র নহে। জীবের **দুঃখ নিবারণের পন্থা-উদ্ভাবন** পাশ্চাত্য দর্শনের লক্ষ্যই নয়। কাজেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা এবং এতদ্দেশীয় উক্ত দর্শনে দীক্ষিত যাঁহারা তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত হিন্দু মোক্ষ শাস্ত্রকে গোল করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রকে তাহারই ভাবে স্বাধীন ভাবে বুঝিলে এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায়। এই সন্দেহ করিয়াই মোক্ষমূলর—বলিয়াছেন "we have in fact to read the Samkhya philosophy in two texts; one as it were in the old uncial writing that shows forth here and there giving the cosmic process, the other in the minuscle letters of a much later age, interpreted in a psychological or Epistemological sense." page 249 History of Ind. part I. (uncial = large round letters, minuscle = small letters). মোক্ষমূলর cosmic সৃষ্টির ব্যাখ্যাই আদিম কপিল মত বলেন। আমার কিন্তু মনে হয় ঠিক বিপরীত। psychological সংসার সৃষ্টিই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ জীব কর্ত্তৃক জগৎকে সংসার ভাবে সৃষ্ট করা। সুপণ্ডিত বটব্যাল মহাশয় এ মতের পক্ষপাতী। ইহাই ঠিক।

পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর তত্ত্বসমাসকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কাপিল সাংখ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থন করেন। যদি এ কথা সত্যই হয়—সন্দেহের কোন প্রমাণ নাই—এবং **সাংখ্যশাস্ত্র যদি মোক্ষশাস্ত্রই হয়** তবে ব্যাখ্যাকারদের উচিৎ—উহার অনুমোদিত সহজ সরল মতটাই গ্রহণ করা—কিন্তু ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্যরূপ;—সাংখ্যদর্শন ভৌতিক সৃষ্টিবাদ আগে হইতে এই ধারণা করিয়া বসিয়া উহার ব্যাখ্যাত সংসার সৃষ্টিবাদ অপ্রামাণিক বলিয়া সন্দেহ করা কি উচিৎ? গীতায় ১৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকোক্ত 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ' পদের টীকাকালে শ্রীধরস্বামী লিখিতেছেন "অবিবেককৃতাৎ আত্মাধ্যাসাৎ ভবতীতি—" বিদ্বিম্বাবর জঙ্গমং।

২৭ শ্লোকও দেখুন। সংসার সৃষ্টিই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য ভৌতিক সৃষ্টিবাদ (cosmic creation) উহার প্রতিপাদ্য ধরিয়া উহার Technology ব্যাখ্যা করিতে গেলে বহুস্থানে অবোধ্য হইয়া বসে ; তখন গোঁজা মিল দিয়া মিলাইতে গিয়া মুস্কিলে পড়িতে হয়। যেমন মোক্ষমূলর করিয়াছেন, তিনি বলেন যে আদিতে cosmic creation ব্যাখ্যাই কপিলের মনোগত মত ছিল, পরে তৎশিষ্যগণ হস্তে Psychological creationএ দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্ব তত্ত্বসমাসমতে অধ্যবসায় ascertainment একবস্তু হইতে অপরের লক্ষণ ভেদ ; ইহা গরু, গাধা নহে, ইত্যাদি differentiation বোধ। মোক্ষমূলর স্বীকার করেন যে দেশীয় ভাষ্যকরেরা বুদ্ধিতত্ত্ব ঐ ভাবে বুঝেন ; এ কথা বলিয়া ও তিনি নিজে জোর করিয়া বলিতেছেন যে Sense is more important than commentary অতএব Budhi or Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe—and however violent our proceeding (interpretation) may be we can hardly help taking this Mahat in a cosmic sense. (page 246) কিন্তু সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি জড় বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি বুঝিলে তত্ত্বসমাসের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমস্ত ব্যাখ্যাতেই এই গোলমাল লাগিবে। ত্রিগুণ তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই ; গুণ 'দ্রব্য' না ভাবিয়া প্রকৃতি ধর্ম্ম (moral qualities of human nature) যথা, ধর্ম্ম—অধর্ম্ম, ন্যায়—অন্যায় ইত্যাদি, বুঝিতে হইবে ; তত্ত্বসমাস তাই বুঝেন ; তা না ভাবিয়া 'দ্রব্য' ভাবিলে আবার সব গোলমাল। গীতাকার নিশ্চয়ই খাঁটী আদিম কাপিল সাংখ্যের মর্ম্ম বুঝিতেন, তিনি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে নিম্ন লিখিত ব্যাখা দেন—"

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা—
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ং
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং ॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

পরে নবম, দশম একাদশ শ্লোকে গুণত্রয়ের সামর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গীতাবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায় সত্ত্ব রজঃতম মানবপ্রকৃতির গুণমাত্র ; যে প্রকৃতিতে যে গুণাধিক্য তাহার ক্রিয়া তদ্বৎ। তত্ত্বসমাস বুদ্ধি বা মহৎ

তত্ত্বের আটপ্রকার রূপ বলিতেছেন—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম ; জ্ঞান-অজ্ঞান ; বৈরাগ্য আসক্তি ; ঐশ্বর্য্য-দৌর্ব্বল্য। যাহারা মহৎকে আদি-cosmic intelligence বলিতে চাহেন তাঁহারা কিরূপে বুদ্ধির ব্যাখ্যা বুঝাইবেন ? জীব সৃষ্টির কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে cosmic primordial matter heterogeneous হইয়া পরিণাম-মুখী হয়। তখন সেই বুদ্ধির ধর্ম্মাধর্ম্ম আসক্তি বৈরাগ্য এ সব লক্ষণ কোথা হইতে হইবে বা তাহার অর্থ সার্থকতা কি ? বুদ্ধির সামর্থক বাক্য যথা :—মন, মতি, মহৎ ব্রহ্মা ; খ্যাতি ; প্রজ্ঞা ; শ্রুতি ; ধৃতি ; প্রজ্ঞান সন্ততি ; স্মৃতি ; ধী। এ সবের কি অর্থ হইবে যদি cosmic primal intelligence ইহার মানে হয় ? আবার দেখা যায় পঞ্চমহাভূতের সমার্থ বাক্য যথা বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূঢ় ! এ সবের অর্থই বা কি ? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূতকে, প্রকৃতির বিকার বলা হয়। পুনশ্চ :—পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বিচারে তত্ত্বসমাসকার বলেন, ক্রিয়া ত্রিবিধ :—যথা (১) ধর্ম্ম দয়া সংযম, চিন্তা ঐশ্বর্য্যবোধ ইত্যাদি) (২) কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ঠুরতা, অশান্তি, বর্ব্বরতা ইত্যাদি (৩) উন্মত্ততা, মাদকতা, আলস্য, নাস্তিক্য, কাম, নিদ্রা, অপবিত্রতা,—অধর্ম্ম। ইহারা পুরুষের ধর্ম্ম বা গুণ নহে ; প্রকৃতির গুণ, সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের বিবিধ বিচার মাত্র ! এ সত্ত্বেও মোক্ষমূলর বলিতেছেন "We see here the same narrowirg of cosmical ideas" ! অথচ আচার্য্য নিজেই বলিতেছেন "we must never forget that these qualities belong to nature never to Purusha apart from Prakriti."

যদি তাই হয় এই সব গুণ প্রকৃতির গুণ তবে আমার জিজ্ঞাস্য Primordial matterএর এই সব moral qualities বলিলে কিছু কি পরিষ্কার বোঝা যায় ব্যাপারটা কি ? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে গুণত্রয়কে গুণই বলা হইয়াছে, গুণ ইন্দ্রিয়েরই শক্তি। দ্রব্যভাবে কুত্রাপি নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং। সং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং শ্বেত। ৩। ১৭। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৪ শ শ্লোকে সেই কথা।

অথচ স্থানে স্থানে গুণকে দ্রব্য বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হয়। এ ভাবে বুঝিতে গেলে প্রকৃতিকে এই জড়ময়ী জগৎশক্তি ধরিতে হইবে, এবং প্রত্যেক বস্তু পুরুষ সম্বন্ধে গুণযুক্ত। হয় ভাল, না হয় মন্দ, না হয় indifferent। গুণী ও গুণ যদি অভেদাত্মক ধরা হয় তা হইলে গুণকে দ্রব্য

বলা যায়। সত্ত্বগুন মানে যে সব দ্রব্য চৈতন্তের পক্ষে প্রকাশকসুখকর রজগুণ মানে—যে সব দ্রব্য চৈতন্তের পক্ষে চেষ্টাকর কষ্টকর; এবং তমগুণ অর্থে যে সব দ্রব্য মোহজনক উন্মাদক বা দুঃখজনক।

সে যাহা হউক, আমার মূল বক্তব্য এই যে হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র মুখ্যতঃ মোক্ষ শাস্ত্র; পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্রের মত শুষ্ক তর্কশাস্ত্র নহে, এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে আদৌ ভিন্ন নহে। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন আর্য্যহিন্দুর চক্ষে, বেদ উপনিষদ স্মৃতি দর্শন সকলেরই এক মহান উদ্দেশ্য। ত্রিবিধ তাপতপ্ত সংসারী জীবকে উহা মুক্তির পন্থা দেখাইয়াছে।

এই মহান উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রের নহে তাহা হিন্দুর চক্ষে অপরাশাস্ত্র তাহার মূল্য অতি কম, তাহার কার্য্যকরিতা সামান্তই। তবে বেদ উপনিষদে ও দর্শনে তফাৎ এই বেদ উপনিষদ শ্রুতি, উহার দর্শিত পন্থা যেন দিব্যদৃষ্টিতে লব্ধ, আর দর্শনের দর্শিত পন্থা বুঝি বিতর্কিত যুক্তির দ্বারা লব্ধ। বেদের সহিত দর্শনের বিশেষ সাংখ্যের তফাৎ এই যে বেদ ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞাদির ভিতর দিয়া মুক্তি নির্দ্দেশ করেন; সাংখ্যকার কপিল দেবদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে মিথ্যা উপায় বা অপূর্ণ উপায় বলিয়া যুক্তির দ্বারা আত্মা-নাত্ম বিবেক দর্শন করান। উভয়েরই উদ্দেশ্য ভবরোগের চিকিৎসা; ঔষধ নির্ণয় কেবল ভিন্ন।

দর্শনের এই উদ্দেশ্য যে উপনিষদ হইতে ভিন্ন নহে তাহা সমস্ত উপনিষদ গ্রন্থেই বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। আর বদ্ধজীবের সমস্ত দুঃখের মূল যে সংসার মায়া ইহাও স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত; এই সংসার সৃষ্টির ফলাফল মৈত্রায়ণী উপনিষদের ৩।২। অধ্যায়ে অতি সুন্দরভাবে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে; উহার ইংরাজী অনুবাদ আচার্য্য মোক্ষমূলরের গ্রন্থ হইতে তুলিয়া দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব—উহাতে কথিত হয় যথা—There is indeed that other different one called the Elemental Self (ভূতাত্মা) who over come by the bright and dark fruits of action, enters on a good or evil birth, so that his course is upward or downward and that overpowered by the pairs of the opposites (সত্ত্ব, তমঃ, বা রজ, তম ?) he roams about. And this is the explanation. The five Tanmatras are called Bhuta and the five Mahabhuts are called Bhuta. Then the agregate of all this is called sarira,

body, and he who dwells in that body is called Bhutatman. True his Immortal Atman remains untainted, like a drop of water on a lotus leaf, but he the Bhuttatman is in the power of the Gunas of Prakriti (গুণ শক্তি) Then thus over powered he becomes bewildered, and because thus bewildered, he sees not the creator i e the Holy Lord abiding within him, carried along by the Gunas, darkened, unstable fickle, crippled, full of devices, vacillating he enters into Abhimana (অহংকার) (conceit of subject, object) believing "I am he" 'this is mine' etc. He binds himself by himself, as a bird is bound by a net, and overcome afterwards by the fruits what he has done, he enters on a good or evil birth, downward or upward in his course and overcome by the pairs he roams about."

উপরের ছত্রে গুণ সম্বন্ধে উপনিষদ কারের মত প্রনিধানের বিষয়। আর এক কথা ; উক্ত উপনিষদিক উক্তিতে আমরা সাংখ্যও বেদান্তের মিশ্রন দেখিতে পাই। এই উভয় মত যে বহু প্রাচীন কালেও দুই সমান্তরাল প্রবাহি নদীধারার মত প্রবাহিত ছিল তাহা বুঝা যায় আর বুঝা যায় যে সেই প্রাচীনতর কালে উভয় মতে পরবর্ত্তীকালীন মারাত্মক ভেদ হয় নাই। আর একটা সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য—মোক্ষ শাস্ত্র হিসাবে উভয় দর্শনেরই একমত :—জীব দুঃখাঘাত হইতে কষ্ট পায় ; এই দুঃখ সংসার হইতে উৎপন্ন। জীব অবিদ্যা বা অবিবেক বলে, দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের বস্তুগুলিকে প্রয়োজন বোধে হেয় প্রেয় ভাবিয়া নিজ নিজ মনোমত একটা সংসার রচনা করিয়া এই বিশুদ্ধ সদামুক্ত আত্মাকে এই হেয়-প্রেয় নশ্বর বস্তুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করিয়া (identify করিয়া) তাহাদের প্রাপ্তিতে হৃষ্ট ও অপ্রাপ্তিতে বিমর্ষ হইয়া উন্মত্তের মত ছুটাছুটী করে ; ভ্রমবশতঃ বুঝিতে পারে না যে এই রং দেওয়া মমতার পোছ দেওয়া **জগৎটা** অর্থাৎ সংসারটা মিথ্যা ; স্বরূপে নির্ব্বিকার আত্মা বা পুরুষই সত্য ও নিত্য তাঁহার প্রাপ্য অপ্রাপ্য কিছু নাই, তাঁহার নাশ বা ক্ষয় ভয় নাই। এইটী বিচার বলে বুঝিলে অর্থাৎ পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা বা জগৎ-ব্রহ্ম 'জগৎ-সংসার' হইতে ভিন্ন অর্থাৎ world Brahman is different from world-Samsara তাহা হইলেই

মুক্তি বা কৈবল্য লাভ। মুক্তির পর প্রকৃতি নাচিতে থাকেন বটে তবে পুরুষ আর ভোলেন না, অন্যপক্ষে জীব নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝে আর জগৎব্রহ্ম হইতে সংসার রং-এর পোছ মুছিয়া যায় বা আবরণটা উঠিয়া যায়। যে অজ্ঞান রঙ্গীন কাচ টা মাঝে থাকিয়া জগৎরূপী ব্রহ্মকে সংসাররূপ দিয়াছিল তাহা সরিয়া যায়। জগৎ যেমন তেমনিই থাকে, উহাতে হেয়ত্ব প্রেয়ত্ব মমত্ব রংটা থাকে না। জগৎটা উঠিয়া গিয়া, নদনদী ঘটপট, পাহাড় পর্ব্বত, জন্তু মানুষ সব একাকার nebula হইয়া যায় না। এই কথা কেবল কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগলে বলে।

আসলে মূল কথায় সাংখ্য বেদান্ত আদিমকালে একই কথা বলিয়াছিল! পরে ভ্রান্ত তার্কিকেরা দলাদলি করিয়া বিশুদ্ধ মোক্ষশাস্ত্রকে শুষ্ক অর্থহীন তর্কশাস্ত্রে দাড় করায়। আমি এই বুঝিয়াছি। বারান্তরে তত্ত্ব সমাস ও সাংখ্য কারিকার বিশদ analysis দ্বারা আমার কথা প্রমাণ করিব।

আমার ধারণা সমর্থনের জন্ত যে তত্ত্বসমাসের ভাষ্য হইতে উক্তি ও যুক্তি সংগ্রহের কথা বলিলাম তাহার হেতু আছে। অনেকে হয়তো বলিবেন, তত্ত্বসমাস অপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ কারিকা ও প্রবচনসূত্র। এই শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বিবৃত সাংখ্যমতই সর্ব্বজন আদৃত ও মান্য। উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তত্ত্বসমাসই বিশেষজ্ঞ সাংখ্য পণ্ডিতদের দ্বারা সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত। এই জন্যই মোক্ষমুলর বলেন তত্ত্বসমাস হইতেই আমরা সঠিক জানিতে পারি "what really was in its original form!" তাঁহার মতে কারিকা ও প্রবচনসূত্রের মধ্যে সাংখ্য তত্ত্ব বিশেষ বিশদভাবে ও সুষ্ঠুপ্রকারে the Sankhaya ব্যাখ্যাত হইলেও "all that is essential can be found in the Samasa" পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই জন্যই তত্ত্বসমাসের একটা মোটা রকমের বিবরণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব—সাংখ্যশাস্ত্র পাশ্চাত্য দর্শনের সমজাতীয় দর্শন নাম অপেক্ষা মোক্ষশাস্ত্র নামেরই যোগ্য। জীব কর্ত্তৃক বাহ্য জগৎ অবলম্বনে কিরূপে সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত হয়, এবং কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ইহাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য।

মুক্তি

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

সে দিন ১১ই ডিসেম্বর রবিবার। সারা ভারতের নব জাগরণের হিল্লোল পদ্মার বিপুল তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে বুড়ীগঙ্গার শান্ত বুকের উপর দিয়া ঢাকানগরীর তটপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। মানবের স্বাধীন চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ, তাহার শান্তিপূর্ণ দেশহৈতিষণার প্রতি সন্দেহ, দেশবাসী নিবিরোধ-প্রতিবাদ ও আইনলঙ্ঘনের দ্বারা প্রতিকার করিতে উদ্যত হইল। ফলে, দেশ-প্রেমিক কর্ম্মবীরগণ কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ১০ই ডিসেম্বর তারিখে অবরোধ-বিধি তাহার সীমায় আসিয়া পৌছিল এবং ভারত-পূজ্য ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হইলেন, তখন দেশবাসীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। আজ ১১ই তারিখে তাই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকা-নগরীতেও দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"ঝন্—ঝন্—ঝন্
খুলিয়াছে ওই তোরণের দ্বার,
আয় সন্তানগণ!
আয় শত শত হাজার হাজার,
রেখেদে চিন্তা, রেখেদে বিচার,
অদূরে মায়ের মরকত মোড়া
হৈম সিংহাসন।
বহুদিন—ওরে বহুদিন ভাই,
কি যেন নেশার লোভে,
কাটিয়াছে তোর দীর্ঘ দিবস
ব্যর্থ আশার ক্ষোভে।
আজ খুলিয়াছে মুক্তির দ্বার,
ডেকেছে জননী সন্তানে তার
লজ্জা সরম রাখিতে এবার
কর-রে-জীবন-পণ।"

ক্রমে প্রথম দল ঢাকা স্কুলপ্রাঙ্গণ পার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের নিকট উপস্থিত হইল। দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া প্রথম দলের নেতা সুশীল বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দলের অন্যান্য সকলে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াও অবরুদ্ধ হইল না, তখন গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চলিল—

"ওরে রে মরণ-যাত্রি।
অদূরে হাসিছে উষার সুষমা,
আর নাই কালো রাত্রি।
সকল বিষাদ প্রেমে কর জয়,
সকলের প্রেমে মাতাও হৃদয়
জগত ভরিয়া দাও পরিচয়—
মা তোর জগদ্ধাত্রী।"

* * * *

আজ ১২ই ডিসেম্বার সোমবার। সবেমাত্র আদালত খুলিয়াছে, তখনও ১২টা বাজিতে বিলম্ব আছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই আদালত-গৃহ দর্শক ও স্বেচ্ছাসেবকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ সুশীলকুমারের বিচারের দিন। সুশীলকুমার ঢাকানগরীতে বিশেষরূপেই পরিচিত। ছাত্রজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রহিসাবে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর কত প্রশংসা সে পাইয়াছে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া যখন সে গবেষণা-বৃত্তি পাইল, তখন তাহাকে সকলে সোনার টুকরা বলিয়া আদর করিয়াছে। অল্পদিন হয় ঢাকা-কলেজের অধ্যাপকপদে মনোনীত হইয়াও দেশজননীর আহ্বানে সে সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন অনেক ধমকাইয়া শেষে মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া জবাব দিলেন। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মাতুল মহাশয়—যিনি পূর্ব্বে সুশীলকুমারের বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসায় শত-মুখ হইতেন, তিনিও মূর্খ বাতুল বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া সম্পর্ক ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু মানুষের মনে যখন একটা প্রেরণা জাগে, সে তখন কে কি বলিল বা ভাবিল ইহা লক্ষ্য করিবারও ত সময় পায় না। তাই সুশীলকুমার যখন কর্ত্তব্যের ডাকে দেশজননীর আহ্বানে বাহির হইয়া পড়িল, তখন কোনও কথা তাহার কাণে পশিল না। দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া দেশের সেবা করাই, সে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিল।

আজ ভগবানের কোন্ ইচ্ছার ইঙ্গিতে সুশীলকুমারের বিচারের ভার পড়িয়াছে তাহার একমাত্র মাতুল ঢাকার প্রথম ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট হিমাংশুমোহনের উপর। তাই শুধু সুশীলকুমারের গুণমুগ্ধ হইয়াই দেশবাসী আজ আদালতে ঝুকিয়া পড়ে নাই, তাহা ছাড়া এই অপূর্ব্ব বিচাররহস্য দেখিবার জন্য অনেকের অত্যধিক কৌতুহলের লক্ষণ দেখা গেল।

* * * *

হিমাংশুবাবু খুব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এজলাসে আসিয়া বসিলেন। না, তিনি কিছুতেই বিচলিত হইবেন না। কঠোর বিচারক বলিয়া সরকারের নিকট তাঁহার সুযশ ছিল। তিনি আজও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। হতভাগাটা যেমন তাঁহাদের সৎপরামর্শ না শুনিয়া রাজবিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছে তেমন ফল লাভ করুক। কিন্তু হিমাংশু বাবুর মনের এক কোণে কে যেন মাথা উঁচু করিয়া বলিয়া উঠিল—ছিঃ, দুঃখিনী বিধবা ভগিনীর নয়ন পুত্তলী যে। অমনি তাঁহার সরকারী মনটা শাসাইয়া বলিল, না, ওসব কোন কাজের কথা নয়, সুশীলটাকে শিক্ষা দিতে হইবে গুরুজনের অবাধ্য হওয়ার ফল কি, আর এ ক্ষেত্রে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ঠিক রাখিতে পারিলে প্রমোশনটাও শীঘ্র হইতে পারে। হিমাংশু বাবুর সম্মুখে সুশীলকুমারকে আনা হইল। ডেপুটি বাবু আসামীর মুখের দিকে না তাকাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি শিক্ষিত যুবক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে কারাবাসের জন্য অত ব্যাকুল হয়েছ কেন?" সুশীলকুমার উত্তর দিল—"প্রথমেই আমার পূজনীয় মাতুলহিসাবে আমি আপনাকে প্রণাম করি।" কথাটা শুনিয়াই হিমাংশুবাবু একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। সুশীলকুমার বলিতে লাগিল—"এইবার বিচারক হিসাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি কি মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য বড় সরকারী চাকরী লাভ করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করা? আর সেটা না করলেই ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়। এর চেয়ে কি শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য নাই? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ ও দশের সেবার যোগ্যতা। পশুরাও ত নিজের আহারের যথেষ্ট সংস্থান করে, মানুষ কি তবে পশুর চেয়ে একতিলও বড় নয়। যদি বড় হয়, সে শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? ত্যাগ ও সংযমে শিক্ষার ফলে যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহাতেই জীবনের সফলতা। এ ছাড়া যদি আর কোনও ধারণা শিক্ষা সম্বন্ধে কারও থেকে থাকে, তবে সেটা মস্ত ভুল। জানেন রামপ্রসাদে আছে—"লোকে করে সুখের গর্ব্ব আমি করি দুখের বড়াই।" জগৎএতদিন

সুখের গর্ব্ব করেই এসেছে, আজ ভারত দেখাবে দুঃখেরও বড়াই করা চলে বিশ্বের দুয়ারে ভারত যে বাণী পাঠাবে, তার প্রথম কথাই হবে যে দুঃখদহনের মধ্যদিয়ে ভারত মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। সে সাধনাই আমাদের স্বরাজ সাধনা। জানেন আমাদের দেশপূজ্য নেতা চিত্তরঞ্জন কি বলেছেন—"আমাদের দেশ আজ একটা বৃহৎ কারাগার।" কারাগার কার কাছে? যারা সুখের লোভে সংসারে বিচরণ করে, দু'পয়সা পেয়ে আনন্দে অধীর, ইংরেজের স্বেচ্ছাকৃত গোলাম হ'য়ে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাদের কাছে বাঙ্গলা দেশ কারাগার নয়? তবে কারাগার কার কাছে? যাদের হৃদয়ে এই দাসত্বের জ্বালা আগুণের মত জ্বল্‌ছে, তাদের কাছেই এ কারাগার। একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাণের পরতে পরতে হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনে বোঝা যে স্বরাজ ছাড়া আমাদের গতি নেই। এমনিধারা স্বরাজের জন্ম একটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙ্গে বেরুতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুণ যার প্রাণে জ্বলবে, তাকে যে ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে! আমাদের নেতৃবৃন্দ যে এমন অকুণ্ঠিতচিত্তে কারাবাসকে বরণ করে নিচ্ছেন, তার মধ্যে তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাঁরা ভোগবিলাস ত্যাগ করে কারাবাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে সমগ্র জাতির যুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করবেন। কারণ এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে জাতির দুঃখদৈন্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দূর হইবেই। কারাগারেই কংসবিনাশন ভগবানের জন্ম হয়েছিল। আজ এই কারাগারে ভগবান্ কি আবার জন্মিবেন না?"

সুশীলকুমার এইখানে তাহার বক্তব্য শেষ করিল। আদালতের সকলে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহা শুনিতেছিল, একটি কথাও কাহারও মুখ হইতে ফুটিল না। কেবল সকলের মধ্যে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া পরস্পরের সহিত এবিষয়ের নিঃশব্দে আলোচনা করিয়া গেল। আদালত নিস্তব্ধ, হিমাংশুবাবু রায় প্রকাশ করিলেন—আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সকলে স্তম্ভিত, এ কোন্ ন্যায়ের বিচার ভগবান্ জানেন। কিন্তু উপস্থিত সেচ্ছাসেবকগণ আনন্দিত মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

আজি ভারত গগনে
কি শুভ লগনে
মুক্তি-উষাহাসি ফুটিছেরে।

ঐ যে কাণে কাণে
বিহগ প্রাণে প্রাণে
তুলিল তানে তানে
আশার বাণী রে ;
অলস ঘুমঘোরে
মোহের বাঁধা ডোরে
ভারত জাগে ওরে
শকতি আনি রে ;
আজি পবনে পবনে
মধুর লগনে
শান্তি—সঙ্গীত ধ্বনিছেরে।

• • • • •

আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া হিমাংশু বাবু সুশীলকুমারের মাতুলানীর নিকট বলিতে লাগিলেন—"দেখ, সুশীলটা যেমন আমাদের কথার অবাধ্য হয়ে—রাজ-দ্রোহীদের দলে মিশেছিল, তেমন তার আমি খুব শাস্তি দিয়ে এসেছি। এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।" শুনিয়া হিমাংশু বাবুর স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন, একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"কি বললে আমাদের সুশীলের বিচারের ভার তোমার উপর পড়েছিল? তুমি তাকে একবৎসরের কারাদণ্ড দিয়ে এসেছ? তুমি আমায় অবাক্ করলে। তার দোষ? সে রাজদ্রোহী? নিজের দেশবাসীর জন্য তার প্রাণ কেঁদেছিল, তাই সে জীবনের সব সুখ-স্বচ্ছন্দের আশা ত্যাগ করে—ভোগ বিলাসকে পায়ে দলে দেশের ভাই বোনদের দুঃখে কাঁদতে গিয়েছিল! তুমি বলবে সে বাতুল! কিন্তু এমনি পাগল সব না থাকলে এই অধঃপতিত দেশ আজ কোন্ শ্মশানে ভস্মীভূত হয়ে যেত কে জানে! সে রাজদ্রোহী? অপরাধ, সে তার দেশের ভাই বোনদের উলঙ্গ অবস্থা দূর করবার জন্য তাদের চরকা ও তাঁত চালিয়ে পরণের কাপড় তৈয়ারী করতে উপদেশ দিচ্ছিল ; গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের অস্বাস্থ্যকর-তার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। মস্ত অপরাধ? হাঁ গভর্ণমেণ্টের চক্ষে মস্ত অপরাধ বই কি! তারা ত চায় না দেশের শিক্ষিত লোক গ্রাম-বাসীদের সাথে মিলে মিশে কাজ করে। তাতে যে দেশের দারিদ্র্য কিছু

কমে, আর ওদের অর্থশোষণে যে বাধা পড়ে। অর্থলিপ্সুর জাত, ওরা যা বলবে, তোমরাও কি তাই বুঝবে? তোমরা না শিক্ষিত? ওঃ বুঝতে পারিনি ওদের শ্রীচরণে যে শিক্ষা বলি দিয়েছ, তোমরা যে ওদের কেনা গোলাম। বুদ্ধি আর ঘটে কোথা থেকে থাকবে।" এই বলিয়া সুশীল কুমারের মাতুলানী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। এই সময়ে হিমাংশু বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা যে তাহার সুশীল দাদাকে বড় ভাল বাসিত, সে তার জেলের সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হিমাংশু বাবুর পত্নীর নয়নযুগল ও জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাঁদিস্ নি মা, তোর সুশীল দাদা দেশের কাজে করাগারে গেছে, সে ত আমাদের আনন্দের কথা, তার আত্মীয় বলে যে আজ আমাদের গৌরব করবার দিন, কাঁদবার দিন ত নয়। আয়, আমরা মা ও মেয়ে মিলে সুশীলের পরিত্যক্ত কাজের ভার নিই। আজ প্রতিজ্ঞা কর দেশের ভাই বোনদের সেবায় সমস্ত প্রাণ সঁপে দেব। তারপর যখন সুশীল ফিরে আসবে, তখন দেখাব যে তার কাজ আমরা পড়ে থাকতে দিইনি।"

এতক্ষণ হিমাংশু বাবু নীরবে সব দেখিতে ছিলেন এবং এক মনে পত্নীর কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। এতক্ষণে এইবার তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক বলিয়াছ, এতদিন মোহের ঘোরে নিদ্রা যাইতে-ছিলাম, শিক্ষার অভিমানে পদগৌরবে মনে করিয়াছিলাম আমি যাহা বুঝি তাহাই বুঝি সব চেয়ে ভাল। কিন্তু আজ সে অভিমান দূর হইয়াছে। সুশীল আমার পুত্র স্থানীয় হইলে ও, আজ সে আমাদের আদর্শ। আমি ও আজ হইতে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলাম এবং যতটুকু সাধ্য দেশের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিব।"

* * * * *

আজ ২০শে ডিসেম্বর। ঢাকার কমিশনার সাহেব হিমাংশু বাবুকে তাহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। হিমাংশু বাবু উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—"রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষ্যে ২৭শে যে উৎসব হইবে, তাহার সমস্ত ভার আপনার উপর দিলাম। আপনি এখানকার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর যে রকম কার্য্যদক্ষ, তাহাতে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিব। আর এককথা, আপনি সে দিন এখানকার রাজদ্রোহীদের

নেতাকে যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার শীঘ্র প্রমোশনের জন্য লিখিয়া পাঠাইতেছি। শুনিলাম সে ছোড়াটা না কি আপনার আত্মীয়, বোধ হয় দূর সম্পর্কের হবে, না? তা যাক্ বিদ্রোহীদের এম্নি করে পাপের তলায় দাবান চাই।" হিমাংশু বাবু ধীর স্থির ভাবে বলিলেন—"সে দিন যাহাকে আমি কারাদণ্ড দিয়াছি, সে আমার নিকট আত্মীয়, আমার বড় আদরের ভাগিনেয়; এখন বুঝিয়াছি দেশদ্রোহী সে নয়, দেশদ্রোহী আমরা। আমার মোহ কাটিয়াছে, অভিমান দূর হইয়াছে। তাহাকে আমি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। আর আপনার উৎসবের আয়োজন আমার দ্বারা কিছুই সাহায্য হইবে না। দেশে এখন অশান্তি, উৎসবের এ সময় নয়।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কমিসনার সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন—"র‍্যাসকেল, এখনি তোমাকে lowest grade এ নামাইয়া দিলাম।" অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হিমাংশু বাবু বলিলেন"—অত কষ্টের আপনার প্রয়োজন নাই, আমি পদত্যাগের পত্র সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছি, এই তাহা গ্রহণ করুন। আমি চলিলাম। দেশ আমায় ডাকিয়াছে, আমি সেখানেই চলিলাম।"

* * * * *

ঢাকা নগরীতে হিমাংশু বাবুর পদত্যাগের কথা অচিরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক হিমাংশু বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হিমাংশু বাবু তাঁহার স্ত্রী কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ভাইরা আমার, সুশীল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। এতদিন যে অন্ধকারে ছিলাম তার থেকে আজ আলোকে সেই আমায় নিয়ে এসেছে। সে তোমাদের নেতৃস্থানীয় ছিল, আমাদের তার মত যোগ্যতা নেই; তবে আমরা তিন জনে তোমাদের সেবা করে তার অভাব যতটা পারি দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। আজ আমি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে অন্তরে বাহিরে মুক্ত। আজ আমার মুক্তির দিন। বল ভাই বন্দে মাতরম্। গান্ধী মাহাত্মী কি জয়! দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়।"

হিমাংশু বাবু, তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে সম্মুখে রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ গাহিতে গাহিতে চলিল—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস—
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"

—————

শান্তি সংগ্রাম

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

(১)

সবল! তোমার রক্ত আঁখির আর রাখি না ভয়!
রুদ্র বলে হয় কি কখন ক্ষুব্ধ হৃদয় জয়!
সাগর শোষি' করছ তুমি বারির কণা দান!
তাতেই তোমার এতই দম্ভ এতই অভিমান!
ভিক্ষা তোমার আজকে তবে শিকায় তোলা থাক্!
দয়ার দায়ে রক্ষাকর—আর করো না জাঁক!
চুকিয়ে দিয়ে লেনা-দেনা ফিরছে ঘরে ঘরের ছেলে,
দল্‌তে তারে চরণতলে চাচ্ছ তুমি অবহেলে!
তুমি প্রবল তুমি সবল কর্‌ছি না ত দ্বেষ,
অস্ত্রে অস্ত্রে নয় এ সমর জানেন পরমেশ!

(২)

বুকের মাঝে যে দেব নিত্য রাজেন সংগোপনে,
দুয়ারে তাঁর ধন্না মোদের আজকে প্রাণে মনে!
অনেক কালের অনেক গ্লানি মুছতে হবে নয়ন জলে,
শান্তি মন্ত্রে দীক্ষা যে তাই নিলাম সবে কুতূহলে!

চণ্ডনীতির দণ্ড ভীতি প্রীতির মধু সুধা-স্রোতে,
আজকে মোরা ভাসিয়ে দেব স্বার্থে অন্ধ জগৎ হতে'!
দীনের আত্মা নয় যে দীন সে যে পরম শক্তিধর,
সুপ্তি যদি টুটে রে তার পায় যে মুক্তি চরাচর!
রিক্ত যারা বিত্ত তাদের চিত্ত ভরা রয়,
খোঁজ যে তার নিতেই হবে—ভরসা কৃপাময়!

(৩)

ভোগের মোহে মত্ত সবাই, ত্যাগের পথ আমরা লব,
প্রেমের যাগে আপনারে উৎসর্গিয়া অমর হব!
মুখাপেক্ষী নাহি গো কারো, ধারিনে আর কারো ধার,
নিজের মাঝে বুঝ্‌তে নিজে চাই যে নিজের অধিকার!
আপন বলে হবই হব আজকে মোরা বলীয়ান,
মাথা পেতে নিতেই হবে বিধির বিধি "স্বরাজ" দান!
সাধন ভজন পূজন মনন তাই যে শুধু মোদের আজ,
কথার মায়া ছেড়ে এবার সার করেছি সত্য কাজ!
আঁধার ঘরে জল্‌ল আলো মরা-গাঙে আস্‌ল বাণ,
ধ্রুব লক্ষ্য স্থির হয়েছে হবেই হবে পরিত্রাণ!

(৪)

অভিশপ্ত সগর বংশ বুঝি রে আজ উদ্ধারিতে
ভগীরথের শঙ্খধ্বনি, যাচ্ছে শোনা চারি ভিতে!
সুরধুনীর সুধা-ধারায় উঠ্‌ছে জেগে পতিত যারা,
ধূলায় লুটে চূর্ণ হয়ে যুগ-যুগান্তের রুদ্ধ-কারা!
অকাশ বাতাস পূর্ণ করে ওই উঠেরে বিজয়-নাদ,
স্পর্শমণির স্পর্শ পেয়ে মিট্‌ল বুঝি সকল সাধ!
হে ঐরাবত! সরে দাঁড়াও! হবে না আর গায়ের জোরে!
মায়ের ছেলে লুটেই নিবে আজকে ঠিক্ মায়ের ক্রোড়ে'
দয়াল হরি! করুণা করি দেখাও সবে অভয়-পাণি,
সফল যেন হয় গো ভবে মহাত্মার দিব্য-বাণী!

———

বাঙ্গালার জাতীয়-সাহিত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্, এ,]

জাতীয় সাহিত্য বা national literature বলতে আমরা কি বুঝি? জাতীয় সাহিত্য মানে জাতির সাহিত্য বা রচনা-বিবরণ নয়, জাতীয় সাহিত্য একটা সমগ্র জাতির পিতৃ-পরিচয়। বাঙ্গালার যা জাতীয় সাহিত্য, তা বিদেশীয় সাহিত্যের প্রতিবেশ-প্রভাবে একেবারে চাপা পড়ে গেছে। মহাকবি রবীন্দ্র নাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের উপর একটা স্বর্ণ-সেতু নির্ম্মাণের জন্য বিশ্ব-জয়ে বেরিয়ে আমাদের এই অসহকারিতা-মথিত বাঙ্গালাদেশে এসে যে বক্তৃতা গুলি দিয়েছেন, তাতে তিনি এই ভাবটী জানাতে চেয়েছেন যে, দু'জগতের একটা মিলন-বন্ধন না হলে আমাদের আর গতি-মুক্তি নেই। অসহকারিতা এই মিলন-বন্ধনের হিরণ্যকশিপু।

আমাদের জাতীয় জীবনের মুখ্য সুরটী কি, তা আমাদের ভাল করে জানা নেই। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যই কি আমাদের জাতীয় সাহিত্য? না, পরবর্ত্তী যুগের বিশাল চৈতন্য-সাহিত্যই আমাদের জাতীয় ভাব-দ্যোতক সাহিত্য? কিংবা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-গঠিত সাহিত্য আমাদের জাতীয় ভাবের পরিপোষক সাহিত্য? অথবা এই সমস্ত বিশিষ্ট সাহিত্য আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্য? কথাটার বেশ সোজা উত্তর দেওয়া বড়ই শক্ত। কিন্তু আমরা বেশ জানি, যে-সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে গভীরভাবে বিজড়িত, তাহাই 'জাতীয়' বিশেষণ-যোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস-পরিবৃত হাসির গানে আমাদের জাতীয়তার স্ফুরণ বা প্রকাশ হয়নি, কিন্তু তার 'আমার জন্মভূমি' বা 'আমার দেশ' সমগ্র ভারতবর্ষের গভীর প্রাণ-স্পন্দন প্রকাশ করছে। রবীন্দ্রনাথের খৃষ্ট-ধর্ম্ম-পরিচায়ক অনেক-গুলি সুন্দর গান জাতির হৃদয়স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু তাঁর অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত উপনিষদের বিরাট ভাবে অনুপ্রাণিত বলে সেগুলি জাতির হৃদয়ে অতি উচ্চ আসন পেয়েছে। ফরাসী সাহিত্যে হিউগো, বদেলেয়ার, মিস্ত্রাল, গী-দ্য-মোপাসাঁ বিচিত্র যুগের লেখক,—তাঁরা ফরাসী দেশের হৃদয়ের কথাটী নিপুণ ভাষায় জানিয়েছিলেন বলে দেশ-বরণ্য হয়ে আছেন। ফরাসীর সেই অটুট কর্ম্মশক্তি, ধৈর্য্য, বারম্ব ভাবপ্রবণতা, অনলস অধ্যবসায়, আন্তরিকতা

ও নারীপূজা,—ইহাই তাঁরা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। জাতিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা কোথাও স্বদেশিকতা নষ্ট করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) আছে, যুগে যুগে যা-কিছু এই সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপটাতে এসেছে, তাই ইহা নিজের রসরক্তে মিশিয়ে নিয়েছে। সব ভাষার এই অদ্ভুত গ্রহণ-শক্তি নেই; ভাষার গ্রহণ-শক্তি থাকলেও বিদেশী জাতির উগ্রগন্ধ মদিরতা সব জাতির ধাতে সয় না। গত শতাব্দীর শেষভাগে মিশনারীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বাঙ্গালা দেশটাকে একটা প্রকাণ্ড খৃষ্ট-ধর্ম্ম-দীক্ষিত উপনিবেশরূপে পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা হয়েছিল; তার কিন্তু ফল হলো উল্টা। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করে' উপনিষদ-গৃহীত মন্ত্রাবলী থেকে বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব হলো। বাঙ্গালীর খৃষ্টান হ'য়ে যাবার ভয় কেটে গেল। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই ধর্ম্ম-সংঘর্ষ ব্যাপারটা যুগে যুগেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এটা গীতার একটা সমাধি-প্রবচন (esoteric) নয়, যখনই বিজাতীয় ধর্ম্মের উত্থান, তখনই জাতীয় নবধর্ম্ম-শক্তির উন্মেষ! তবে বাঙ্গালা ভাষার যে গ্রহণ-শক্তি নেই, তা বর্ত্তমান যুগে আর বলা চলে না। কিন্তু গ্রহণ করা চলে অনেক জিনিষ, কিন্তু শেষে তা বদ্-হজম হয়। গত নবযুগের প্রথমে যখন সমাজে বিরাট পরিবর্ত্তন চলছিল, তখন আমরা:অনেক জিনিষই গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারিনি। যে-সব জিনিষ বদ্-হজম হয়েছিল, তা যথা-সময়ে আমাদের আত্মশক্তি হরণ করে নিয়ে চলে গেছে। তাই এখন আমরা বিচিত্র আলোকাহত হ'য়ে ভবিষ্যতের বিপুল অন্ধকারের দিকে স্তিমিতনয়নে চেয়ে আছি। সমাজে এমনি একটা বিশৃঙ্খলতা, উচ্ছ্বাস ও প্লাবন এসেছে যে কারো চুপ করে বসে থাকবার যো নেই। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে যেমন সকলের দেহই আবেগ-চঞ্চল হয়ে ঠেলাঠেলির পেশাপেশির মুখে ক্রমশঃ এগিয়ে বা পেছিয়ে চলে, একমুহূর্ত্তেও স্থিতিশীল হয় না, তেমনি যুগধর্ম্মবশতঃ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভিড় কেটে গেলেই সব চঞ্চলতা দূর হ'য়ে যায়। জগতে যাঁরা আত্মসমাহিত ধ্যানী পুরুষ, তাঁরা নির্ব্বিকার শিবের মত সাময়িক উত্তেজনা-কেন্দ্রের বাইরে থাকেন,—তাঁদের চিন্তার ধারা চরকা-নির্গত সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন সূত্রের মত, তার মাঝে কোনও কিছুর সংযোগ-সম্ভাবনা নেই। এমার্সনের একটী প্রবন্ধে এক সামান্য ঘটনার বিবরণ আছে। রাজপথে বিচিত্রবেশ সেনাদল ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে

শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছে ; পথে ভীষণ জনতা, সকলেই সেই দৃপ্ত সাহসোজ্জ্বল তরুণ সৈন্য দলের দিকে চেয়ে আছে। এমন সময় পাশের বাড়ীতে একটী শিশু লাঠি নিয়ে একটা কেট্‌লি বাজাতে আরম্ভ করে দিলে, তখন সেই বিচিত্র সেনা পরিচালনা না দেখে সকলের দৃষ্টি সেই ভাঙ্গা কেট্‌লির কর্ণপটহবিদারী শব্দের দিকে গেল।—কেট্‌লির খেলা ও শব্দ এমনি চিত্তাকর্ষক বোধ হলো। এই সামান্য ঘটনায় সংঘমনের (mob-mind) বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। যার মনে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি আছে, সে ক্ষণিকের মোহে ভোলেনা, আকাশ যখন প্রলয়ের বজ্র-নিনাদে আলোড়িত হতে থাকে, তখনও সে দূরাগত সঙ্গীতের প্রচ্ছন্ন ও শান্তিময় স্তব্ধতার মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখতে পারে। কারণ যেটা শান্ত, তাহাই যে চিরন্তন ; ধূলি যে আমাদের পদতলে চিরকাল পড়ে আছে শান্ত হয়ে, তাই জগতের সব গৌরব দর্প, দম্ভের শেষ পরিণতি এই ধূলিতে। বদ্‌-হজমি জিনিষ খুব পেট ভরে খেয়ে বেশ প্রথমটা আনন্দ হয়, মনে হয় গায়ে খুবই জোর হবে, কিন্তু জিহ্বায় যে জিনিষটা প্রথমে মধুর হয়, তাহাই শেষে উদরে গিয়ে বিষ হয়ে পড়ে,—তখন নানা উপায়ে উদ্‌গার করতে হয়। আমাদেরও কি ঠিক এই দশা হয়নি ? বর্ত্তমান কালের সভ্যতা বলতে যা বুঝায়, তা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হলে ইংরাজী সভ্যতা, শিক্ষা ও রীতিনীতির যা-কিছু-ভালো আছে, সবই গ্রহণ করতে হবে। খুবই ভাল কথা। জগতের সব রাস্তা যখন রোমে গিয়ে মিশেছিল, তখন যে-দেশেই রোম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেই দেশেই সর্ব্বতোভাবে রোম্যান্‌ হয়ে গিয়েছিল, তার আর কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকেনি। এমনতর সংমিশ্রণ হলে একটা পেছিয়ে-পড়া বিদেশী জাতির পক্ষে খুব সৌভাগ্যের কথা বটে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা কি সম্ভব হবে ? এ বিষয়ে সাহিত্যিক ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। আমাদের শুধু সুদূরের দিকে অপলক-নয়নে চেয়ে থাকতে হবে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের সময় যখন দেশ তান্ত্রিকতা ও শূন্যবাদের মোহে আচ্ছন্ন, তখন আশু প্রলয়-সম্ভাবনায় দেশ ধর্ম্মকেই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড বলে' মেনে নিছলো। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় অহেতুকী প্রীতি ও সেবাতন্ত্র যখন মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে যোদ্ধ-ভাবাপন্ন, তখন এই ধর্ম্মই দেশ রক্ষা করেছিল। ধর্ম্মই ভারতের বন্ধন-রজ্জু। এক ধর্ম্মবুদ্ধি থেকেই দেশভক্তির বিকাশ; ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ সাহিত্যই জাতীয় সাহিত্য। কিন্তু যে জাতির ধর্ম্ম নেই, যার বিশিষ্ট

সমাজ-বন্ধন নেই, তার কি জাতীয় সাহিত্য থাকতে পারে না? আমাদের মতে এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব থাকলেও তাকে বর্ব্বর-সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। যন্ত্র-তন্ত্র, বিজ্ঞানশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি এই সবের সমবায়ে এই আপাতরম্য ইয়োরোপীয়ান্ সাহিত্য গড়ে উঠলেও এর মাঝখানে দু'হাজার বছরের পুরাণো খৃষ্ট ধর্ম্মের বিপুল সংহত শক্তি এখনও অটুট আছে। তাই এ সাহিত্য 'বর্ব্বর' হয়নি, ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে চলেছে।

আমাদের দেশে এই ধর্ম্মভাবটী বিশেষ ভাবে জেগে উঠেছিল কথায়, ছড়ায়, গানে ও কবিতায়। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য একটা লৌকিক প্রেমের উপমা দিয়ে কৃষ্ণরাধার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী গড়ে তুলেছিল। ঘুমপাড়ানির গানেও সেই ধর্ম্মের উদ্দীপনা মধুর ভণিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ছেলেদের কথা সাহিত্যেও এ ভাবটী বেশ ফুটে উঠেছে। ঘুমন্ত রাজপুরীতে গিয়ে রাজকন্যার উপদেশ মত রাক্ষসদের আসবার পূর্ব্বেই সাহসী রাজপুত্র দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বিল্বপত্রদলের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিলেন। এই ধর্ম্মভাবটা কেউ মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয়নি,—এটা এমনি নিশ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অন্তরধন হয়ে গিয়েছে।

বাঙ্গালী বড় ভাবপ্রবণ জাতি। পরের সঙ্গে এমন করে মিশে যেতে বোধ হয় আর কোনো জাত পারে না। দুটো মিষ্ট কথা শুনলে অমনি তাহার মন-প্রাণ গলে যায়। গৃহের নিবিড় বন্ধন, স্বদেশের প্রবল আকর্ষণ ও স্বল্পেই পরিতোষ—বাঙ্গালীর মজ্জাগত আদর্শ। সব কাজেই সে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও এই ভাবপ্রবণতাই তার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। তাই এই রক্ষণ-শীলতার শক্তি আজ বাঙ্গালীর জীবনে ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ পরের যা-কিছু আছে, যা-কিছু হাতের কাছে পেয়েছি—তা-ই ধার করে, নকল করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মেকী মাল যে জগতে চলে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই জন্য একটা বিপুল সাহিত্যিক আন্দোলনও এসে পড়েছে। জাতিত্বের ধারা বজায় রাখতে হলে এ প্রশ্নকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারবো না।

আমাদের বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্যের প্রথমোন্মেষ হয় রামমোহন রায়ের যুগ থেকে। তিনি তদানীন্তন যুগের একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাঁর মনের শক্তি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমুদ্র-পারেও চলে গিয়েছিল, আর স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে মিলন স্থাপনের প্রথম প্রয়াসটা তাঁরই

মনে জেগেছিল। তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি ধর্ম্মকে আগলে রাখেন নি বুকের কাছে বিধবার দুঃখ ও কষ্ট-সঞ্চিত ধনের মত,—তিনি দাতাকর্ণের মত এই চিরপোষিত ধন আত্ম ও পরসমাজে বিলাতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর প্রারব্ধ সেই বিরাট বিশ্বজিৎ যজ্ঞের বর্ত্তমান ঋত্বিক কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁরই পথে অনুসরণ করেছেন। এক যুগের চেষ্টা কখনও ফলবতী হয় না। যুগযুগান্ত ধরে সে চেষ্টার অব্যাহত গতি চলে আসছে তার সিদ্ধি এত সহজলভ্য নয়। বাঙ্গালা ধর্ম্মগত ও বিদেশের ঐহিক উন্নতিগত প্রচেষ্টা কালধর্ম্মে এক অখণ্ড যোগসূত্রে ধরা দেবে কি না, তা আমাদের জানা নেই ; তবে আমরা এই জানি যে, যে-যুগের দিকে পিছন ফিরে আমরা এগিয়ে চলেছি, আর সেযুগে ফিরে চলবার আশাও নেই উপায়ও নেই ; আবার এমনো হতে পারে না যে সবাই মিলে আমরা বিদেশের মন্ত্রতন্ত্রে একদিনেই দীক্ষিত হয়ে পড়বো। এর একটা আপোষ আছেই,—কিন্তু কতদিনে আমরা সে চিরাকাঙ্ক্ষিত আদর্শটা লাভ করবো, তা কে জানে ?

দেশের কথা।

[শ্রী নীরদরঞ্জন মজুমদার]

ভারতের আকাশে তামসী রজনীশেষে ঊষার রক্তিমাটুকু ছড়িয়ে পড়ল। আকাশের শুভ্রতারা প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিজালে ডুবে গেল। নয়নের দ্বার আজ সহসা মুক্ত হ'ল, তাইতো বিশ্ব আজ এমন সাজে সাজ্‌ল—আকাশে বাতাসে মুক্তির হাওয়া বয়ে গেল। নবীন উৎসাহে তরুণ সাহসে বুক ভরে গেল। হৃদয়ে হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা সহস্র ধারায় ঝরে পড়ল চোখে মুখে বুকে সুদৃঢ় তেজস্বিতার রেখা সুস্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। দুনিয়ার সকল স্বাধীন মানুষের মত উচ্চশির হয়ে পথে পথে আজ এ দেশেরও মানুষ বেড়িয়ে পড়ল। ইংরেজের কলিকাতা; ফরাসীর চন্দননগর, পর্ত্তুগীজের গোয়া ইউ-রোপীয় পতাকা স্বচ্ছন্দে বহন করে থাক, হিন্দু মুসলমানও আজ ভারতের নগরে নগরে,পল্লীতে পল্লীতে স্বরাজের পতাকা উন্মোচন করে পৃথিবীর শান্তি অর্জ্জনের

পথে চলেছে ; সে পথে ভারত আজ কারো বিরোধী নয়—ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিন, জাপান, পাহাড়িয়া, পাঠান, সবাই ভারতের বন্ধু, সবার সহানুভূতি কল্যাণকামনা না পেলে তো আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। প্রকৃত কথা,যতদিন স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একজন ভারতবাসী ইংরেজের সাহায্য করবে, ভারতে বৃটীশ-শাসন ততদিন অব্যাহত থাকবে—তার গায়ে স্বাধীন ভারত একটী আঁচরও দেবে না। আমাদের আদর্শ জগতে প্রচার করাই আমাদের জাতীয় জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার উদ্দেশ্য—ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে খাপ্‌ছাড়া সঙ্গীন আস্ফালন করে আগাগোড়া সবটাই খাপ্‌ছাড়া, সঙ্গীন ও ব্যর্থ-নিষ্ফল করে তোলা নয়। হিন্দু স্বাধীন মানুষ হ'তে চায়, স্বাধীন পশু হ'তে চায় না। জগতের শান্তি স্থাপন করতে হ'লে আজ দেশে দেশে দেশবাসীর কাণে কাণে প্রচার করতে হবে যে, দেশের উপর অধিকার দেশবাসীর, কোন Voted Interestsএর নয় ; গোড়ার এই অধিকার দখল ও স্বীকার না হ'লে পর কোন শান্তি-বৈঠক দ্বারা শান্তি-স্থাপন অসম্ভব—গান্ধী, ডি ভেলেরা, উইল্‌সন কারো সাধ্য নয় !

ভারতের নব জাগরণকে জগতের হিতে কেমন করে সার্থক করে তোলা যায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর আজ ভারতবাসী মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। প্রথমতঃ আমাদের স্বার্থরক্ষার স্থূল কথা—অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা যা, তা শিক্ষায় দীক্ষায়, ভাষায় ভাবে, ধর্ম্মে-আচারে, ব্যবহারিক ও সামাজিক আদান-প্রদানে শুদ্ধভাব বজায় রাখার কথা। 'শুদ্ধভাব বজায় রাখা' অর্থে অনেকটা 'লুপ্তধন পুনরুদ্ধার করা' কারণ দীর্ঘ শতাব্দীর মিশ্রণের ফলাফলে অনেকখানি হলাহল উঠেছে, তাই পরিহার করা। তার উপায়, গান্ধী-প্রদর্শিত নূতন পথ "সাহচর্য্য ত্যাগ" অথবা 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং' পুরাতন চাণক্য-নীতি। শেষোক্ত পথ অর্থাৎ দুর্জ্জনের সান্নিধ্য পর্য্যন্ত বর্জ্জন করা সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধী ভাব, সুতরাং আশুফলপ্রদ। মৃণ্ময় পাত্রের কাংস্যময় পাত্রের সান্নিধ্যই বর্জ্জনীয়। যাদের সংস্রব-বর্জ্জনে আমাদের প্রকৃত হিতসাধন, তাদের সঙ্গত্যাগ করে স্থানান্তরে সরে যাওয়াই বিধেয়। এই "সরে যাওয়াই" পথটা বেশ সম্পষ্ট নয় তাই প্রশ্নটা হচ্চে যে, সরে যাবার শক্তিটা প্রকৃত আছে কি না এবং কোথায় যাব ? সংঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন এ শক্তি অর্জ্জনের উপায়ান্তর নাই ; কিন্তু "কোথায় যাব" এ তালার চাবি কোথায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর কোথায় ? মুসলমান মুহজ্জিরিনরা এর এক উত্তর দিয়েছেন, "দেশান্তরে

যাওয়া।" আমার নিবেদন এই যে, এটা সদুত্তর নয়—কারণ, এটা হতাশার উত্তর, কিন্তু নিরাশ হ'লেও যে হতাশ হয়নি সে কখনও এ উত্তরের সমর্থন করবে না; এর দ্বিতীয় ভৌগোলিক কারণটা হচ্ছে এই যে, এত বড় দেশ আমাদের, এ দেশ ছেড়ে ভাই-বন্ধুদের ফেলে কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই আমাদের, আর কোটি কোটি নর-নারীরও মুক্তি কয়েকটা মাটীর কেল্লার মধ্যে বন্দী হয়ে নেই—তথাপি এ সত্যকে এড়িয়ে চলা মানেই পুরুষকারকে অবহেলা করা। দেশকে 'বৃটীশ সাম্রাজ্য' বলে ছেড়ে দেশান্তরে পালান সহজ হ'তে পারে, কিন্তু পালাবার সীমানা পালাতে পালাতে অবশেষে সব 'লাল' হয়ে যাবারই সম্ভাবনা এবং এই সম্ভাবনাটাকে এড়াতে হ'লে মনে মনে সঙ্কল্প করা চাই যে, দেশ ছেড়ে কোথাও সরে গেলে চল্‌বে না। ইস্‌লাম ধর্ম্মের দিক্ থেকে যে সৌভ্রাত্রের পতাকা ইস্‌লামীয় বীর ও ফকিরগণ কর্ত্তৃক সুদূর স্পেনে আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের তটপ্রান্ত হ'তে ব্রহ্মসীমান্তে চীন সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত প্রোথিত হয়েছিল, আজ সেই পতাকা বস্ফোরসের পশ্চিম তটে নির্ম্মূলিতপ্রায়, আর ভারতবর্ষ হ'তে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত! ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্প্রসারণের দিনে এই বর্জ্জনের শিক্ষা ছিল কি? দেশত্যাগের ফলে পরিত্যক্ত নিরীহ দেশবাসীর উপর নির্য্যাতন ভার লাঘব না হয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এই কারণে আফ্রিকা, আমেরিকা ও মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে প্রবাসী ভারতবাসীর আজ যে দুর্দ্দশা, সেই প্রবাসযাত্রার অন্যতম ফল স্বদেশে ভারতবাসীর দুরবস্থা। স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ব্যর্থ চেষ্টার মূলে ভারতবাসীর ও আইরিশদের দেশত্যাগ একটা মূল কারণ। সাতশ বছরের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে মুসলমান আজ যদি হিন্দুকে ছাড়ে, হিন্দু আজ মুসলমানকে ছাড়বে না। তবে হাঁ, কোথায় যাব? প্রশ্নটা রয়েইছে, সদুত্তর চাই।

বহুকাল পূর্ব্বে রোম সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বিফল মনোরথ হয়ে প্লিবিয়ানরা (প্রজাশক্তি) প্যাট্রিসিয়ানদের (রাজশক্তি) সাহচর্য্য বর্জ্জন করে রোমনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নূতন নগর নির্ম্মাণ করেছিল, কিন্তু তারা ইটালী পরিত্যাগ করে নি। ফরাসী-বিপ্লবের সময় নির্য্যাতিত ফরাসী জাতি তো ভাবে নি "দেশ ছেড়ে কোথায় যাব?" দেশ ছাড়া দূরে থাক, প্যারিস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নি এবং রাজার রক্তে রাজত্বের অবসান ঘটায়, প্রজার পূর্ণপ্রভাব রাজধানী প্যারিসেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু হাঙ্গেরীর নির্ব্বিরোধ সাহচর্য্য বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা

ফ্রান্সিস্ ডিক্ (Francis Deak) ও হাঙ্গেরিয়ান প্রতিনিধিরা কদাচ বুডাপেষ্ট্ পার্লামেণ্ট ভিন্ন ভায়েনা পার্লামেণ্টে সমবেত হন' নেই; তাঁহাদের এই দৃঢ়ভাবে অষ্ট্রীয়ার পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকৃতির মূলে যে শক্তি ছিল তাহারই বলে নিরস্ত্র বীর হাঙ্গেরিয়ানেরা ভাবেনি, 'দেশ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যাব!' বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট্ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কেন্দ্র সমগ্র 'রাশিয়ার বলসেবী প্রভাব' বিস্তারের পূর্ব্বে পেট্রোগ্রাডের পরিবর্ত্তে মস্কোতেই ছিল; রুশজাতি জারের কুশাসনের ফলে এবং যখন শত্রুহস্তে দেশ বিধ্বস্ত তখন পর্য্যন্ত এদিকে নিশ্চয়ই মিথ্যাচারী দেশনায়কের সামরিক বিধিব্যবস্থায় কর্ণপাত করেনি, ও অপরদিকে 'দেশ ছেড়ে কোথায় যাব' না ভেবে দেশেরই মাটির অধিকার দখল করে নিয়েছিল এবং এপর্য্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপে বিভিন্ন স্বাধীন দেশে মৈত্রীস্থাপন করা ভিন্ন দিগ্বিজয়েও তারা দেশ দেশান্তরে ছুটে আসে নি, বরং দেশের মাটী অধিকার করতে বিভিন্ন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে—দেশে দেশে এই নব জাগরণের মূলে তাদের লোকবল, অর্থবল তত নেই, যত আছে তাদের সহানুভূতি আর ইতিহাস। তাদের ইতিহাস বলতে সমগ্র রাশিয়া আজ ইউরোপের মানচিত্রের অন্তর্গত হয়েও চীনও ভারতের মত প্রাচ্য এশিয়ারই অন্তর্গত। ফলতঃ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরও আজ এশিয়ার অন্তর্গত। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা আজ দম্ভভরে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিরুদ্ধে যেন রণতরীর বহর সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! প্রশান্ত সমুদ্রেও কিন্তু ঝড় উঠেছে, প্লাবনে জল-স্থল-আকাশ আবার ছেয়ে ফেলেছে, তার কলের পুতুলের প্রাণ নিমেষেই অতলজলে বুঝি ডুবে যায়! প্রলয় যে স্বজনেরই পূর্ব্বাবস্থা! ঐ রাশিয়ায়, ঐ মিশরে স্বজন আরম্ভ হয়ে গেছে, ভারতেও এই স্বজনের পূর্ব্বাভাষ উষার অরুণরাগের মত ফুটে উঠেছে। আমরা আজ যে পথে দাঁড়িয়ে আছি, এ যে দেশে ফেরার পথ। তাই স্পষ্ট করে আবার বল্‌ছি "দেশে ফেরা চাই।" চাবির তোড়ার এই ছোট্ট চাবিটিতে "কোথায় যাব?" তালাটী খুলবে না কি?

"দেশে ফেরা চাই!" এ আর নতুন কথা কি? সোজাদিকে চাবি ঘুরিয়ে তালা যখন বন্ধ হয়েছে তখন উল্টোদিকে চাবি ফেরান ছাড়া গতি কি? যাঁরা চাবি ফেরাতে নারাজ, সোজাই চাবিটা ঘুরিয়ে তালা ভাঙ্‌তে চান, তাঁদের চাবিটাই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। যাঁরা 'দেশান্তরে যাওয়া চাই' এই মেকী চাবিটা এনেছেন, বোধহয় তালার চেয়ে চাবিটা বড় বলেই তালা

খোলেনি; অপরপক্ষে আমার এই দেশে ফেরা চাই চাবিটা স্বহস্তে প্রস্তুত ও নেহাৎ ছোট, সম্ভবতঃ সকলের উপেক্ষার বিষয়। আশা এই, মহাত্মা গান্ধীর চর্কা-চাবিটা আজ আর তত উপেক্ষার বিষয় নয়। "দেশ" কথাটার ভেতর আমার চাবির দাঁত রয়েছে—'দেশ' বল্‌তে আমি যা বুঝি তা কলিকাতার মত ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালাই করা বৃহৎ সহরও নয়, আর জরাগ্রস্ত পল্লীসমাজও নয়,—তবে কি? "দেশ" অর্থে অফুরন্ত প্রকৃতির সম্ভার একদিকে, আর একদিকে দেশবাসী এবং এতদুভয়ের একটা নিবিড় যোগাযোগ। প্রকৃতিকে ছেড়ে বেঁচে থাকাই 'মৃত্যু' প্রকৃতির কোলে মৃত্যুই 'জীবন', প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগ সম্বন্ধ আজ নেই—নগরেও নেই, পল্লীতেও নেই—সে সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, 'কার শ্রম-লব্ধ ধন কে ভোগ করে!' দেশবাসী প্রকৃতির সম্ভার অবহেলা করে ছুটে আসে সর্ব্বনাশের পথে, আর প্রকৃতির ভাণ্ডার উদ্যোগী যারা, তারা লুঠ করে নিয়ে যায়। শুভ লক্ষণ এই যে, হাওয়াটা দেশের এবার বদ্‌লেছে। একটা প্রশ্ন উঠেছে যে, চাঁদপুর হ'তে প্রত্যাগত আসামের চা-বাগানের শ্রমিকরা দেশে ফিরে বাঁচবে কেমন করে? সহজ উত্তর—'মরে বাঁচবে।' মরতে যারা শিখেছে তারাই প্রকৃত বাঁচ্‌তে শিখেছে, তারা যে 'অমর' হয়েছে—তাদের মরবার ভয় দেখাব আমরা, যারা মরে আছি? বাঁচ্‌বার পথ তারাই নির্দ্দিষ্ট করেছে, তারা আর মরবে না,—তাদের দেখে দেশও প্রাণ পাবে ঐ মরণের পথের পথিক হয়ে; যারা মরেছে, তারা ঐ 'দেশে ফেরা চাই' পথের ইঙ্গিত করে গেছে—অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেছে! যে পথে এতকাল কাঁটা দিয়ে এসেছি আত্মশক্তিতে সে পথ আবার মুক্ত করে নিতে হবে—ফেরবার সে পথ অপরে মুক্ত করে দেবে কেন? এই আত্মবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আত্মহিত ও জগতের হিতে আমাদের স্বরাজ অর্জ্জন সার্থক করে তুলতে হবে। যুগযুগান্তর পরে আবার দেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার নূতন মর্ম্মরবেদী নির্ম্মাণ করুক; হিমালয় যেরূপ পৃথিবীর মেরুদণ্ড স্বরূপ, ভারতীয় সভ্যতা সেইরূপ পৃথিবীর সকল সভ্যতাকে ধারণ করে বিরাজমান হ'ক।

"দেশে ফেরা চাই" অর্থাৎ ভারতীয় ছাঁচে ঢালাই করা নূতন নগর প্রতিষ্ঠা ও অসংখ্য আদর্শ পল্লী গঠন করা চাই। ভারত স্বপ্রতিষ্ঠ হ'বার পর 'স্বরাজ' ভারতের নানাদেশে নানারূপ ধারণ করবে কিন্তু দেশের প্রভূত শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে কোথায়? আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা

(National Education) এবং শিল্পোন্নতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিস্তার কেন্দ্রীভূত না হ'লে পর বিপরীত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঘাত প্রতিঘাতে (Hostile environments এর মধ্যে) নিষ্ফল হয়ে যাবে। সুতরাং সফলতা পেতে হ'লে কেন্দ্রীভূত হওয়া চাই। মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ এখনও বাংলায় আছে, ইংরেজের কলিকাতা, ফরাসীর চন্দননগর ঐতিহাসিক স্মৃতি বুকে ধরে টিকে আছে ও টিকে থাকবে, কিন্তু নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় নাগরিক সভ্যতা স্বভাবতঃ ম্লান ও শ্রীহীন হয়ে পড়বে। কালস্রোতে দেশে দেশে এমন কত জনপদ ও পল্লী বুদ্বুদের মত উঠে মিলিয়ে গেল, কিন্তু কোনটাই খেয়ালমত গড়ে ওঠেনি—প্রত্যেকটীরই ইতিহাস আছে। প্রয়োজন মত দেশ কালান্তর্গত অবস্থার অনুযায়ী কত নগর নগরী গড়ে উঠেছে, সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে আবার কালের নিষ্ঠুর আঘাতে, প্রয়োজন ফুরালে, অশোভন হয়ে পড়লে সমৃদ্ধির শিখর সমেত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাম্রাজ্যের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়েছে। মোগল ভারতের দিল্লী-আগ্রা, বাংলায় নবাব ও শেঠদের মুর্শিদাবাদ অমনই বিস্মৃতির গর্ভে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে ঐতিহাসিক, পুরাতত্ত্ববিদ ও পর্য্যটকের কৌতূহল ও বিস্ময়োৎপাদন করছে।

বৃহৎ ও বহু জনাকীর্ণ নগরে মানুষ সঙ্কীর্ণভাবে বাস করে; প্রচুর আহার্য্য বস্ত্রাদির সংস্থান দূরে থাক, বিশুদ্ধ বায়ু পর্য্যন্ত সচরাচর মেলে না। অভাব সৃজন ও অভাব পূরণ করতে করতে অবসর অভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রায় দুর্ঘট হয়ে ওঠে। নগরে বাস করার মূলে যে উচ্চ আশা, আকাঙ্ক্ষা জীবনকে রঙিয়ে রামধনুর মত বিচিত্র করবার বাসনা, তা প্রতিদিন দারুণ অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মনে হয়, পল্লীর মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন গুজ্‌রান করে প্রচুর দীর্ঘ অবসর সময় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে ও কোকিলের কুহুতানে নিরালায় বসে কাটান কত সুখকর হ'ত। কোন মোহের ঘূর্ণিপাকে ছুটে এসে অন্তরাত্মা আজ বিষিয়ে উঠল? মানুষের এই অন্তরের ক্ষোভ ও মনস্তাপের প্রতি লক্ষ্য করে নূতন নগর নির্ম্মাণের স্থপতিকে সুকৌশলে প্রত্যেকটী ইট বা পাথর

এই প্রসঙ্গে H. G. Wells এর নবপ্রকাশিত সুবিখ্যাত The Outline of History ইতিহাসের The Moglul Empire of Land Ways and British Empire of Sea Ways প্রসঙ্গটী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গাঁথতে হবে। একথা আমাদের স্মরণ রাখতেই হবে যে, পুরাতনের ছাঁচে নূতনকে যতই আমরা ঢালাই করতে যাব, ততই আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কলিকাতা নয়, মুর্শিদাবাদ নয়, নবদ্বীপ নয়, বাংলায় একেবারে নূতন আবহাওয়ার মধ্যে প্রকৃতির স্নেহময়ী কোলে ফিরতে এই নব জীবনকে মুক্ত করতে হবে! আমাদের সৃষ্ট নূতন নূতন নগরে বিদেশী বণিককে আমরা বন্ধুভাবে আহ্বান করব, প্রভুভাবে নয়। তবেই বিদেশীর একাধিপত্যের আওতায়, ব্যর্থ শিক্ষার মোহে আকৃষ্ট হয়ে, ভ্রান্ত দরিদ্র নিরাশ্রয় দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের জন্য লালায়িত হয়ে পথে পথে ধনীর দ্বারস্থ হওয়ার দুঃসহ দাসত্বের লাঞ্ছনার অবসান হবে। ধনীর অহঙ্কার, দরিদ্রের হাহাকার, মধ্যবিত্তের দাসত্বস্বীকার যে দেশে আজ বিধির বিধান বলে স্বীকৃত সে বিধানের আমূল পরিবর্ত্তন করতে হলে কিরূপ বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব কিরূপ organisation আবশ্যক, কিরূপে সংঘবদ্ধ হ'লে প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী তার যথাযথ সদুত্তর চাই।

নূতন নগর নির্ম্মাণ করা সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নও আমাদের অক্ষমতার ও অবসাদের পরিচয় দেয়। সত্য বটে, যে সমাজ 'দানা বেঁধে উঠেছে' তাকে এক কথায় ছাড়া চলে কি? তবে আর একটা কথা, তার একদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে দেখতে পাই যে একটা মস্ত ক্ষয়ের অঙ্কও জমা হয়ে আছে; বর্ষার ধারায় যার অনেকখানি ধুয়ে মুছে গেছে, বৃথা তার মমতা না করে নূতন সংঘ জীবন, নূতন ভিত্তির উপর গঠন করবার মত শক্তি উপার্জ্জনের প্রয়াসই শ্রেয় নয় কি? মানুষ সমস্ত শক্তি দিয়ে যে কাজ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে কাজ কখনই অসাধ্য নয়। যে নাগরিক সভ্যতা আমরা গড়তে চাই সর্ব্বাগ্রে সে সভ্যতার স্বরূপ সুস্পষ্ট জানা চাই। নূতন নগর কোন আদর্শে সৃষ্ট হবে? ধনীর অর্থ ই কি সেই সভ্যতার তুলাদণ্ডে বাট্‌খারারূপে গৃহীত হবে? সভ্যতার মানদণ্ড নিয়ে যারা পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য অনুযায়ী মানুষকে সভ্য কি অসভ্য সাব্যস্ত করেন, ধনীর টাকার থলি যারা জগতের সকল দরজার চাবি অথবা passport বিবেচনা করেন, যাদের দৃষ্টি স্বচ্ছলতার মধ্যে সভ্যতাকে বরণ করতে সঙ্কুচিত হয়, তাঁরা ইউরোপীয় কুশিক্ষার হলাহল আকণ্ঠ পান করে সভ্যতার উদার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না। স্কটলণ্ডের উত্তরে একটী বরফের দেশ বা দ্বীপ আছে (Iceland); তাঁহার অধিকাংশ ভূভাগ বরফে ও আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ লাভা ও প্রস্তরাদিতে সমাকীর্ণ; সেদেশের অধিবাসিগণ ইউরোপীয়

Scandinavian settlers মুদ্রার দ্বারা বিনিময় তাদের প্রয়োজন হয় না ; তাই মুদ্রার প্রচলন সেখানে নেই। সকলেই একই প্রকার সামগ্রী, প্রতি ঘরে গৃহস্থ নরনারী নিজ নিজ শ্রম লব্ধ আহার্য্য বস্ত্রাদি সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন করেন, মেষ ও হংস পালন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। সভ্যতার মানদণ্ডে এই ৮৫০০০ নরনারী অদ্যাপি সাওতালের মত অসভ্য বিবেচিত হ'ন কিনা জানিনা ; অর্থ তাঁদের নেই, সম্পত্তির মধ্যে ঘরের সামান্য আস্‌বাব আর ব ই—জ্ঞানার্জ্জনে ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে ইঁহাদের আগ্রহ সমধিক। মানুষের আত্মবলের উপর এইরূপ আস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—যারা বরফ ও আগ্নেয় গিরির দেশে বাস করে ও স্বচ্ছলতার তৃপ্তিতে মগ্ন, তাদের কাছে সুজলা, সুফলা দেশে বাস করে ও অন্নবস্ত্রের কাঙাল ভারতবাসীর অন্ততঃ এইটুকু শিখতে হবে—'সভ্যতা বলে যা ধরেছি তাকি প্রকৃত সভ্যতা ? একমাত্র আত্মবলের উপর নির্ভরতা নেই বলেই আমাদের এই হীনাবস্থা। মানুষ বজ্রের মত চরিত্র যেদিন লাভ করবে, সেদিন বুঝবে অর্থ তুচ্ছ—মানুষ মানুষই চায়। এক শক্তিমান মহাপুরুষের ডাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দেশের কাজে আসে, কিন্তু কোটি কোটি মুদ্রায় দেশের কাজে একজন মহাপুরুষ গড়া যায় না ! আজ যদি প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর আদর্শে হিন্দুস্থান ইংলিশস্থানে পরিণত হ'তে হ'তে মর্ম্ম—ত গান্ধীস্থানে পরিণত হয়ে থাকে, হয়ত সেই মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে ভারতবর্ষ 'গান্ধীবর্ষ' বলে একদিন জগদ্বিদিত হবে—কিন্তু কল্পনার পাখা একটু সংযত করে প্রথমে বলতে চাই যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান্ধীপল্লী ও গান্ধীনগর অথবা (Congress town) কংগ্রেস গঠিত নগর এর প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—যেখানে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হলে পর ভারতের ভাবী সভ্যতা প্রচার সহজসিদ্ধ হবে।

সম্মুখে কঠিন কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনে আমাদের আজ পেছিয়ে দাঁড়ালে চলবে কি ? আজ যদি আমরা এ জাতিকে সন্ন্যাস ধর্ম্মেই দীক্ষিত করি, তা হ'লে পাহাড়ের গুহায় গুহায় উপনিবেশ স্থাপন করা ভিন্ন গত্যন্তর কি ? তবে একটা দুর্ভাবনা এই যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম নিয়েই একটা জাতি হিমালয়ে বসবাস করলেই ধর্ম্মরক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা কোথায় ? পাহাড়িয়া মাত্রই তো আর সাধু-ফকির নয়, গুর্খা-আফ্‌গান আজও সাধু-ফকির হয় নেই। অপর পক্ষে মানুষকে গৃহী করে আবার যদি বৈদিক যাগ-যজ্ঞেই ব্রতী করতে হয়, আর রেলষ্টীমার সব তুলে দিয়ে 'মোদের মাসী পিসীর হেঁটে কাশী পাড়ি মারবার'

ব্যবস্থাই পুনরায় হয়, তা হ'লে বদরিকাশ্রম হ'তে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত তীর্থস্থান ক'টার একটু আধটু সংস্কার করলেই চলতে পারে। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আর অপার্থিব জ্ঞানের আদান-প্রদান যদি করতে হয়, তা হ'লে জগৎকে আহ্বান করতে হবে ও জগতের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে—সুতরাং আমাদের হিমালয়ে উপনিবেশ অথবা গুর্থার সুন্দর বনে উপনিবেশের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখাও চলতে পারে এবং তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের আর চা-বাগানের আড় কাঠিদের এড়িয়ে চলেও সংসার যাত্রা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই নির্ব্বাহ করা চলতে পারে।

'সভ্যতা' কথাটার মানে নিশ্চয়ই ধোঁয়া নয়, বাতাসে ভর করে আকাশে চলাফেরা করে না। সভ্যতা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; ভারতে ইউরোপীয়রা দস্তুর মত মাথায় করে তাদের কর্ম্মজীবনের সভ্যতা বয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতায় ভারতবাসীকে শত বর্ষও মুগ্ধ করে রাখা গেল না। ভারতবাসী সহস্র সহস্র বৎসর যে সভ্যতার আদর্শ বুকে করে শান্তির মধ্যে সমাজ বেঁধে বসবাস করছে, তাদের সে সভ্যতা সে ধর্ম্মবন্ধন নানা সভ্যতার সংঘর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপর্য্যয়েও আজও যে টিকে আছে আর যখন বৈদেশিক কোন সভ্যতাই দেশের ধাতসহ হ'ল না, তখন ঐ টিকে থাকার মধ্যে একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে। সত্য বটে, অতিকায় হস্তী লোপ পেয়েছে, 'কিন্তু তেলাপোকা আজও টিকে আছে' এই অজুহাতে "টিকে থাকাই চরম সার্থকতা নয়"—তবে আশা করা যায় যে, চরম না হ'লেও আজও যা লোপ পায় নেই তার মধ্যে সার্থকতার সন্ধান মিলতেও পারে। অবশ্য এ যুগে বৌদ্ধদের গৌরব যুগ অথবা শঙ্করাচার্য্যের হিন্দু সভ্যতা গড়া চলবে না—কিন্তু ভারত সভ্যতায় ধারাবাহিক শৃঙ্খলে ভারতের অতীত যুগের গৌরব স্মৃতি, শৃঙ্খলের অংশ বিশেষটুকু ছেঁটে বাদ দেওয়াও চলবে না এবং অপরদিকে বিদেশীর পরিত্যক্ত সভ্যতার উপর :দাগা বুলোনও চলবে না। নূতন সভ্যতা গড়তে আমাদের এ যুগে নূতন ছাঁচ চাই—এবং সেই নূতন ছাঁচ দেশকালভেদে একই রূপ (form) ধারণ না করে বিচিত্ররূপ ধারণ করবে। কিন্তু তাদের সবার মূলে জগতের হিতে আমাদের সভ্যতাকে কাজে লাগাবার একটা বিরাট প্রচেষ্টা থাকবে, যার সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি ও পরিণতি আমাদের জাতীয় জীবনে পরিলক্ষিত হবে।

নূতন সংঘ—জীবনের প্রয়োজনীয়তা এ যুগে কেন, যুগে যুগে হবে। তবে

এ কথাও ঠিক যে, পুরাতনকে ভাঙবার চেয়ে নূতনকে গড়বার দিকটায় ঝোঁক বেশী হওয়া চাই। পুরাতন বলেই ভাঙা অনাবশ্যক হ'তে পারে—পুরাতন বহুদিন টিকে থাকে, তবে তার শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাস যেথানে শেষ হয় সেখান হ'তে শ্রীহীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে ইংরেজ ইউরোপীয় ছাঁচে কলিকাতায় তার নাগরিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করবার পর একদিকে কলিকাতার (অর্থাৎ এ দেশের মাটীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার) শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অপর দিকে মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন হ'তে থাকে। দীর্ঘ শতাব্দীর এই টিকে থাকার সংগ্রাম একটা দিনের পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মম, অধিকতর কঠোর।

মধুর অপেক্ষা মঙ্গলকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার পথ মানুষকে দেখাতে হবে। আমরা যেদিন আবার সে পথের সন্ধান পাব, উদ্যোগী হয়ে বীরের মত অতুল সাহসে বুকভরে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব, আমাদের সংঘবদ্ধ দেখে সর্ব্ববিধ নির্য্যাতনের অবসান সেই দিন হবে ও 'টিকে থাকতে হ'লে' আমাদেরই সৃষ্ট নগরে আমাদের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন বিদেশীর গতি থাকবে না। আজ যেথানে ব্রাহ্মণ চর্ম্মকার বৃত্তি আশ্রয় করে জীবনধারণ করে, কাল সেখানে সে দুর্ভোগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গুণধর্ম্মী ব্রাহ্মণের পদতলে বসে বিশ্ববাসী জ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসবে।

সুখের ঘরগড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রাহ্মণদের ধনুর্ভঙ্গ পণ হইল তর্কসিদ্ধান্তকে পংক্তিচ্যুত করা ও মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ ব্রাহ্মণ পিছু পাঁচ টাকা জরিমানা লওয়া। মহেশ ভোলানাথকে স্পষ্ট অক্ষরে তাই বুঝাইয়া দিল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া ভোলানাথ দেখে উঠানে দাঁড়াইয়া তর্কসিদ্ধান্ত দক্ষঠাকুরুণ যজ্ঞেশ্বরী, পঞ্চু, বিজয়, ঐ কথাই আলোচনা

করিতেছে। ভোলানাথকে দেখিয়া তর্কসিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হলো ভুলু?" ভোলানাথ চুপ করিয়া রহিল। সিদ্ধান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, "বলই না ছাই, চুপ কল্লে কেন? তারা রাজী নয় এই তো?"

ভো। হাঁ, তারা বরং জরিমানা অর্দ্ধেক নিতে রাজী আছে কিন্তু—

তর্ক। আমাকে পংক্তিতে বসতে দেবেনা এই তো?

ভো। শুধু আপনাকে নয় ওবাড়ীর কেহ না—

তর্ক। উত্তম। তাতো আমি রাজী আছি হে—

য। আমি রাজী নই এতে যা হয় তা হোক—

সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ও কিরণ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়ই না তা গ্রাম ত্যাগ করে ফিরে যেতে হয় সেও ভাল—

তর্ক। শোনো মা—আমি যা বলি, নাই বা যজ্ঞিতে বসুলে পঙ্ক্তি আমি তো যজ্ঞির রান্না খাইনি জানো, যদি এটা কল্লে মান রক্ষে তোমার হয়—

য। আপনার অপমানে মাথা হেঁট করে যোগ দিয়ে আমার মান রক্ষে? মাপ করবেন—বলেইছিতো দ্বিগুণ জরিমানা দিতে রাজি আছি আপনার অপমানে আমি রাজী হবো না—আমি যদি তিনগুণ জরিমানা দি, তা হলে রাজী হবে মনে হয়?

প। আমরা সেইটিতে রাজী নই খুড়িমা! জরিমানা কেন দেবেন?

দক্ষদেবী এতক্ষণ নীরব ছিল, গর্জ্জন করিয়া হাত নাড়িয়া অগ্রসরপূর্ব্বক বলিল—"চামারদের ঐ ব্যবসা এখানে বৌমা! আমার নোটা নেত্য তাঁতির বুড়োমার মড়া পুড়িয়েছেল: বলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা মুখপোড়ারা আদায় করে তবে জাতে উঠতে দেয়—জানিনি আমি? কোন নচ্ছারের কত মর্য্যাদা তা দক্ষ বাউনীর জানুতে বাকী নেই—কুলের কথা আর বলবুনি হাটের মাঝে ঐ ঈশেন হালদারের—"

তর্ক। থাক্ ভাইঝি আর হাড়ি ভেঙ্গে কাজনি—(যজ্ঞেশ্বরীকে) এখন শোনো মা আমার যুক্তি নাও, আমিও সরে দাঁড়াচ্ছি—

য। কিছুতেই আমি রাজী হবোনা—আপনি না খান পংক্তিতে পাত পেতে বসতে হবে থাবার ছুতে হবেনা—ঠাকুরপো তুমি তিনগুণ জরিমানায় রাজী হওগে—

তর্ক। কিছুতে না—এক পয়সা নয়!

বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী এইসব কথা শুনিতেছিলেন, তর্ক-

সিদ্ধান্তের গর্জ্জনে বুঝিলেন জরিমানা দেওয়ার কথা হইতেছে। তিনি বিজয়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "বিজয়কান্ত খপরদার নয় এক পয়সা জরিমানা দেওয়া হবেনা মা কে বলুন।" বিজয় বাহিরে আসিয়া ভবানীর হাত ধরিয়া বলিল—"বা আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে! খেয়াল করিনি, আসুন ভিতরে আপনি যে আমাদের পরম ভরসা।" "থাক্‌না বাড়ীর ভিতর মেয়েরা আছেন—"বলিয়া ভবানী কুণ্ঠা জানাইলেন। বিজয় বলিল—"তাতে কি আমার মা বোন খুড়ী আপনারও তাই।" সেতো বটেই বলিয়া ভবানী অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত ভবানীর মনোভাব জানিয়া বলিলেন "বাবাজী ঠিক বলেছ! অসহ্য হ'য়ে উঠেছে এই কুৎসিৎ অত্যাচার দেখে ব্রাহ্মণ গৌরবের দোহাই দিয়ে এতবড় কাপুরুষতা যে জগতে কোনো জাত দেখাতে পারে তা মনে হয়না! এই ভদ্রলোকের মেয়ে আজ তৃষ্ণার্ত্ত মানুষকে তেষ্টায় জল দিয়ে হলো পতিত! আর—" দক্ষদেবী কথা কাড়িয়া লইয়া বাকীটুকু পূর্ণ করিল "ঈশেন হালদারের বিধবা বোন—"ভোলানাথ চটিয়া গিয়া বলিল "থামো পিসি, আমার আর ছাদ্দ ভাল করে পাকাতে হবে না!" দক্ষ থামিয়া গেল কিন্তু ঘুরাইয়া ইঙ্গিত করিয়া তবে থামিল—"থাম্‌বে কি? হক্ কথা বলবো ডরাই কাকেও, তোর ছ্যাকৃরাটারী বাবুকে বশ করেছে ঈশেন হালদার—"

তর্ক। আঃ থামোনা দক্ষ!

দক্ষ মাথার কাপড় মাথায় ফিরাইয়া আনিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

তর্ক। তা হ'লে কি বলো সব! ভুলুর কি মত?

সকলেই একবাক্যে বলিল আপনাকে পংক্তিচ্যুত করার সঙ্গে আমরা রাজী নই। ভোলানাথ হা না কিছু না বলিয়া ঘরে ঢুকিল।

দেবরের মনোভাব দেখিয়া যজ্ঞেশ্বরী তর্কসিদ্ধান্তের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা এনা কল্লে কি করে মান রক্ষে হয়?"

তর্কসিদ্ধান্ত। উঠে বসো তো মা। মান নষ্ট হলো কিসে যে মান রক্ষের ভাবনায় অস্থির হলে? আর হলে জরিমানা দিয়ে মান উদ্ধার করবে?

য। নইলে যে ব্রাহ্মণ সব অভুক্ত অবস্থায় ফিরে গেলো? পঞ্চু দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"ব্রাহ্মণ হলে যেত না—খুড়ী মা—ভেবনা তার জন্যে। ওতে তোমার প্রত্যবায় হবেনা।"

তর্ক। বারোজন বাউন খেলে তো নিয়ম রক্ষে হয়? তা যোগাড় করে দিচ্ছি—হয়ে যাবে—

য। রাম চন্দ্র! বাউন খেলে না আমরা খাবো তাই হয় বাবা? এত আয়োজন সব নষ্ট হবে?

তর্ক। তাই হয় রে বেটী এ দেশে লক্ষ্মীর অন্নের পরিমাণের চেয়ে পেটের কাঙ্গাল অনেক মা! আর এই দেশ লক্ষ্মী ছাড়া কাঙ্গাল কেন জান? লক্ষ্মীর অপমান করে করেই—এই হয়েছে। লক্ষ্মীর অপমান যারা করে তাঁর অন্ন তাদের জন্ত নয়। যারা লক্ষ্মীর দরদ মর্য্যাদা বোঝে তারা আয়োজনের সার্থকতা করে যাবে।

কিরণ এক গ্লাস সরবৎ মায়ের জন্ত আনিল। যজ্ঞেশ্বরী হাত দিয়া ঠেলিয়া দিল। তর্কসিদ্ধান্ত বলিলেন "তা হবে না মা থাও"। "না বাবা আগে ব্রাহ্মণ দু এক জন খাগ্ তবে হবে।" তর্কসিদ্ধান্ত গ্লাসটা লইয়া ডান হাতে চেটোয় এক ঝিনুক ঢালিয়া গণ্ডুষ করিয়া বলিলেন—"এবার হয়েছে তো নাও মা।"

যজ্ঞেশ্বরী হাত হইতে গেলাসটী লইয়া অন্তরালে সরিয়া গেলেন। তর্ক-সিদ্ধান্ত বাহিরে আসিয়া পঞ্চুকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা যাওতো বাগদী আর দুলে পাড়ায় গিয়ে তাদের সব আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো বাবা মুখুজ্যে বাড়ী ফলার খাবি আয়—"। পঞ্চু ও ভবানী দু জনেই এমনি একটা মতলব আঁটিয়াছিল; সিদ্ধান্ত মহাশয়ের মুখে আদেশ পাইয়া দু জনে খুসী হইল। পঞ্চু চলিয়া গেল। উঠানের এক দিকে ঝাঁতলা পাতিয়া এসমাইল তার ছেলে মেয়ে লইয়া বসিয়া হিঁদুর বাড়ীর সামাজিক সভ্যতার লীলা অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকেও ডাকিয়া বলিলেন—"এসমাইল তুই ও এক কাজ কর আবদুল আর করিমকে ছেলে পুলে নিয়ে আস্তে বলগে যা—"। এসমাইল তার দয়াময়ী মঙ্গলকামিনীর সমাজ শাস্তি দেখিয়া বড়ই ক্ষুন্ন হইয়াছিল; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাক্য-ব্যয় না করিয়া ছুটিল। এ দিকে যজ্ঞেশ্বরী তর্কসিদ্ধান্তের প্রসাদী সরবতের গ্লাস হাতে করিয়া সদুর সন্ধানে রান্নাঘরেরর ভিতর গিয়া দেখে, তারামণি একা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সদু কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তারামণি বলিল—"ভোলাদা ঘরে রাগ করে গিয়ে শুয়ে আছে ছোট বৌদি তাঁরই কাছে বা গেল—"

যজ্ঞেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া ভোলানাথের ঘরে ঢুকিয়া দেখে ভোলা মুখ গুজিয়া বিছানায় পড়িয়া। সদু নীরবে কাছে বসিয়া আছে।

যজ্ঞেশ্বরী ডাকিলেন "ঠাকুরপো"; ঠাকুরপো নিরুত্তর। যজ্ঞেশ্বরী গায়ে

ঠেলা দিয়া ডাকিলেন। সে চোখ চাহিল। যজ্ঞেশ্বরী সরবতের গ্লাসটা ধরিয়া বলিলেন "এইটে খাওতো ভাই" মুখ না তুলিয়া ঠাকুরপো বলিল—"চুলোয় গিয়ে তার পর খাবো।"

যজ্ঞেশ্বরী "তবে আগে খেয়ে নিলে অকারণে যাবার জন্যে তাড়া পড়বে না—নাও ওঠো তো, ছেলে মানুষি করনি—পুরুষ হয়ে জন্মানো টাই তোমার ভুল হয়েছিল—বুঝলে?"

ভো। তা আজ বুঝিছি; তোমারও মেয়ে হয়ে জন্মানোটা কম ভুল নয়।

য। বেশ তো পরস্পরে ভুলের দোষটা তা হলে কেটেই যাবে; আমি পুরুষ গিরিই করবো, তুমি মাদী হয়েই ঘরে পড়ে থেকো—জালা বটে! বলি হয়েছে কি বল তো?"

ভো। আমার শ্রাদ্ধ,—যাও সব, বিরক্তি করনা—

য। খেয়ে নাও বিরক্ত করবো না—আমার মাথার দিব্বি—

অগত্যা ভোলানাথ হাত হইতে গ্লাসটা লইয়া একটু চুমুক খাইয়া রাখিয়া দিল। পরে বলিল—"একটা কথা বৌদি—ওই বাহাদুরিটা না কল্লেই হতো না—

য। ওটা বাহাদুরী নয় কিছুই! যথার্থ বন্ধু যথার্থ মানীর মান রেখেছি তুমি যা পাল্লেনা পুরুষ বাচ্ছা হয়ে আমাকে কুলের বৌ হয়ে সভায় দাঁড়িয়ে তাই করতে হলো—তোমার ভিটেতে যদি অমন পুণ্যাত্মার অপমান হয়, ওই সব শেয়াল বেরালের হাতে তা হলে—যাগ্ তুমি বুঝলে না এই দুঃখ ঠাকুরপো!" যজ্ঞেশ্বরী অঞ্চলে চোখ্ মুছিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সদু বলিল—"দিদির মনে কষ্ট দিও না—উনি যে কত বড়, কত মহৎ কত উঁচুতে তা রোজ একটু করে করে বুঝিছি—সে দিন পুরুৎ গিন্নি আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লে "মাগী দেওরটার ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে যাবে দেখছি—"শুনে আমার মনে একটু সন্দেহ হয়—ভাবলুম দিদি কি মতলব—করেছে নাকি? তার পর সন্দেহের পাপে মন ঘেন্নায় ভরে গেল।—তোমার মনে ওর নামে কত কি হচ্ছে নিশ্চয়ই—সত্যি বল না?

ভো। হোক্ না হোক্ আমাকে এমন করে বিপন্ন করা কেন?

স। উনি কি ইচ্ছে করে করছেন্ বল্তে যাও—ছি! এক করতে আর হয়ে যায় যদি—তা উনি কি করবেন—আর একটা কথা তুমি ও যদি এতো ভেঙ্গে পড়ো তো আমরা মেয়ে মানুষ দাঁড়াব কি করে?

ভো। (উত্তেজিত ভাবে) ভেঙ্গে পড়ি সাধে? তার দাঁড়াবার স্থান

আছে—মাথা গোঁজবার স্থান আছে—আমার তো আর নাই—এইখেনেই এক ঘরে হয়ে মাথা মুখ হেঁট করে দিন কাটাতে হবে। প্রবলের বাদ করে আমার টেঁকা সম্ভব? যাগ্ বেশ হয়েছে—তোমরা ঘর কর আমার দু চোখ যেখানে যায় চলে যাব—

যজ্ঞেশ্বরী আড়াল হইতে স্বামী স্ত্রীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। দেবরের আক্ষেপ উক্তি শুনিয়া ভয় পাইয়া আবার ঘরে ঢুকিলেন। অত্যন্ত গো বেচারী ঠাণ্ডা প্রকৃতির এই স্বামীটীর মুখে এরূপ ধরণের ভয়প্রদর্শনের উক্তি শুনিয়া সদু স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া পড়িল; কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় যজ্ঞেশ্বরীকে দেখিয়া তাহার মনে হইল—ওর বিবাগী হওয়ার কথা দিদি যদি শুনিয়া থাকে তবে কি না জানি ভাবিবে এই আন্দাজ করিয়া সে স্বামীর প্রতি সমবেদনা জানাইয়া বলিল—"সত্যি দিদি কি করতে গিয়ে কি হলো? কেন এ ভাতের হেঙ্গাম করতে গেলে—সাত পুরুষের বাস ভিটে হলেও এ গ্রামে যে কত ভয়ে ভয়ে বাস করতে হচ্চে তা আমরাই—জানছি—"। যজ্ঞেশ্বরী অন্ন প্রাশনটী এই বিভ্রাটের কারণ নয়, কারণ তাঁহারই কাজে কথার ব্যবহারে যে আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখাইয়া আসিতেছেন তাহাই। পঙ্কিল জলস্রোতে মিশিয়া ভাসিয়া যাইতে হইলে নিজের শুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া চলিতে গেলে এমনি বিভ্রাট হয়। দেবরের সংসারে আসিয়া তাহাদের গতানুগতিক জীবন স্রোতের সঙ্গে নিজেদের জীবন স্রোত তাহার সঙ্গে পূর্ণ ভাবে মিশাইতে না পারায় এই পরিণাম হইল! এবং এ জন্য এই যে একটা গৃহ শান্তি ভঙ্গের সূচনা হইতেছে ইহার জন্য তিনিই যে—দেবর ও দেবরজায়ার চোখে দায়ী হইলেন এই ভাবিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, কি করিয়া সে সব দিক বাঁচাইয়া পরিত্রাণ পাইবেন এই ভাবনাটায় এখন তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইল; তবে যেমন প্রবল ঝড়ে দৃঢ় মূল স্থিরকাণ্ড বৃক্ষের উপরেরই ডাল বা পাতা গুলাই নড়ে কাঁপে, কাণ্ডের কোনো চাঞ্চল্য হয় না, তেমনি যজ্ঞেশ্বরীর অন্তর প্রকৃতিটী স্বভাবে তেজপূর্ণ ও নিঃশঙ্ক বলিয়া তিনি দেবরদম্পতীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না তা ছাড়া তর্কসিদ্ধান্তের মত ব্রাহ্মণবীরের ও জমিদারের ভ্রাতষ্পুত্র ভবানীর—চরিত্র বলের ভিতর আর এক নূতন প্রকারের সহায় সাহসের সন্ধান পাইয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। সে সব কথা অপ্রকাশ রাখিয়া ভোলানাথের খেদোক্তি স্মরণ করিয়া—সমবেদনার সুরে বলিলেন—

"ঠাকুরপো কেন ও কথা বল্‌ছ? আমার মাথা গোঁজবার স্থল বা আশ্রয়

স্থল এই শ্বশুরের ভিটা। স্বামী অবর্ত্তমানে দেবর আমার অভিভাবক জেনেই এখানে এসেছি—ভাইএর বাড়ীর কথা বলছ তো তা যদি তেমন হতো তা হলে—আর হলেই বা সেখানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তোমার মান অপমান আমারই মান অপমান আর আমার মান অপমান তোমারই। যদি আমার বুদ্ধির দোষে একটা বিভ্রাট ঘটেই থাকে তা হলে তুমি আমায় সামলাবে রক্ষে করবে না রাগ করে বাড়ী ছাড়া হতে যাবে? যদি আজ সতুর অবিবেচনাতে একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌তো তা হলে কি তাকে ফেলে বাড়ীছাড়া হতে ভাই? আমায় মাপ কর—আমার খুব শিক্ষা হয়েছে আর ক্রটি কখনো হবে না—এখন যাতে সব দিক রক্ষা হয়, তাই করো—রাগ অভিমান করে ঘর ভাঙ্গা ভাঙ্গি ভাল কি?" কথা শুনিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়েই লজ্জিত হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে বাড়ীর প্রাঙ্গণ দুলে বাগদীতে ভরিয়া উঠিল। তর্কসিদ্ধান্ত আসিয়া বলিলেন "ওঠো ভোলানাথ ওঠো মা অন্নপূর্ণা হয়ে এই সব দীন দুঃখী নিরন্নকে পেট ভরে খাইয়ে দেও; তোমাদের আয়োজন সার্থক হোক্—দরিদ্র নারায়ণ এই সব; এরাই অন্নের ভিখারী—দাও এদের আত্মার তৃপ্তি ঘটিয়ে; মহাপুণ্য এতেই হবে—মা—আসল পুণ্যই এই; কলিতে বাউন নেই ব্রাহ্মণ ভোজনও নেই এই সব ভগবানের টুকরো গুলিকে তুষ্ট করে দাও—"

এই বলিয়া তর্কসিদ্ধান্ত নিজের জ্ঞাতি ও শিষ্য কয়জনকে দাওয়ার উপরে খাওয়াইতে বসাইলেন; ভবানীপ্রসাদকেও জোর করিয়া বসান হইল। পঞ্চু ও বিজয় আর দক্ষদেবীর ভাইপো হুটবিহারী নিচে আহুত দুলে বাগদী মুসলমান দিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল।

ভোলানাথ তদ্বৎ অবস্থায় পড়িয়া আছে শুনিয়া তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিলেন; একটু মৃদু ভৎর্সনা করিতেও ছাড়িলেন না। "ভোলানাথ বাবাজী ভাবছো বুঝি গাঁয়ে একঘরে হয়ে থাক্‌তে হবে মেয়ের বিয়ে ছেলের পইতে হবে না! হাঃ হাঃ হাঃ আচ্ছা ছেলেমানুষ বটে! আরে তুমি এক ঘরে, আমি একঘরে, ব্রহ্মঠাকরুণ এক ঘরে হুটবিহারী একঘরে' এতগুলো ব্যক্তি একঘরে হলে তো ভালই হলো হে! ভবানী বাবাজীও বুঝি একঘরে হয় বা!" ভবানী খাইতে খাইতে হাসিল। বলিল "গুন্‌তিতে দেখছি তা হলে আমাদের দশঘরা হয়ে দাঁড়াল তা মন্দ কি?—আমাদেরই একটা সমাজ হয়ে উঠ্‌বে—"।

ভোলানাথ নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। তার অন্তরপুরুষ সনন্দী ভৃঙ্গী সগণ—

মহেশের কুটীল দৃষ্টি মানস চক্ষে দেখিয়া প্রমাদ কল্পনা করিতেছিল। মাথার উপর দোদুল্যমান তরবারি ও আশে পাশে অঙ্কুশের সূচ্যগ্র মুখ তাহার ভবিষ্যজীবনকে যে অসহ করিয়া তুলিবে এ বিশ্বাস তাহার মনে স্থির হইয়া বসিয়া গেল।

এ দিকে মহেশ ও জীবনের আর একটা গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল। অভিসন্ধিটা —এই ; মর্য্যাদার মূল্য গ্রহণ ও তর্কসিদ্ধান্তকে পংক্তিচ্যুত করণ রূপ দুইটী সত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মণরা ভোজনে বসিবে, এবং ভোজনকালে—হঠাৎ একটা অছিলা করিয়া গোল বাঁধাইয়া অভুক্ত অবস্থায় সকলে উঠিয়া যাইবে। সেই অছিলাটীও পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ; জীবন ভাবিয়াছিল, এ ফাঁদে তর্কসিদ্ধান্ত পা না দিয়া থাকিতে পারিবে না, কিন্তু মহেশ ও জীবনের সাবধানে বোনা জালটীকে তর্কসিদ্ধান্তের সহজ সরল বুদ্ধি ও তেজশক্তি একেবারে অবলীলাক্রমে মাকড়সার জালের মত ফাঁসাইয়া দিল। তাহাদেরই জন্য আহৃত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যে শেষে অন্ত্যজ কাঙ্গাল গরীবদের উদর পূর্ণ করিবে এ কথা তাহারা ভাবে নাই। নবীন গাঙ্গুলীর আটচালায় বসিয়া সমবেত ব্রাহ্মণরা আর একবার ডাকিলেই যাইব এই মৎলব করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়াছিল নিশ্চয়ই তর্কসিদ্ধান্ত বা ভোলা তাহাদের পায়ে ধরিতে আসিবে। পঙ্কুকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া জীবন ও ঈশান মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, কিন্তু পঙ্কু কোনো দিকে মুখ না ফিরাইয়া সোজা চলিয়া গেল, এবং সোজা ফিরিয়া আসিল সঙ্গে কতকগুলা দুলে বাগদীর ছেলে বুড়া লইয়া! জীবন চালিয়াৎ লোক, বুঝিয়া লইল ব্যাপারটা কি! সে সকলকে বুঝাইয়া দিল পঙ্কুর এই রহস্যময় গতিবিধির অর্থ কি!

জয়রাম গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল "দেখ্‌লে ভোলা ব্যাটার কাণ্ড হে! ব্রাহ্মণের নামে উৎসৃষ্ট অন্ন কি না দুলে বাগদীর সেবায় লাগালে—"। ঈশেন বলিল—"ভো-ভোলার এটা চাল নয় বুঝলে গাঙ্গুলী ; এতে স-সত্যি বলতে কি ভট্টাচার্জ্জের দা-দা—দাদার হাত আছে—সে—সে-ম্লেচ্ছ পণ্ডিত কি ভায়া সাধ করে নাম দিইছি!" সকলে নির্ব্বাক। যে কয়জন অভুক্ত দ্বিজবর সন্তান—শেষ পর্য্যন্ত আশা রাখিয়া উদরদাহ নীরবে সহ্য করিতেছিল তাহারা চটিল—ঈশেন জীবনের উপর! অনাহারের যুগে অলক্ষ্মীর কৃপায় যাহারা ভাল খাওয়ার মুখ বড় দেখিতেই পাইত না যদি বা ভাগ্যে একদিন জুটীল তা এদেরই কুটীল কুচক্রে সব পণ্ড হইয়া গেল। তাহারা ছেলেগুলার নড়া

ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া মনে মনে—মহেশ জীবন ঈশেন, জয়রাম অ্যাণ্ড কোং কে গাল দিতে দিতে বাড়ী চলিয়া গেল! পরে এই সূত্রেই উহাদের মধ্যে একটা সিভিলওয়ার পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

পাগল

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

ভারতময় বিশ্বজয়ী পাগল আজি জেগেছে,
পাগল-মায়া-কাজল ছায়া নয়নে সব লেগেছে।
ভুলেছে সাজ ছেড়েছে লাজ প্রেমের মহা-মিলনে,
প্রেমের হাটে যোগের নাটে ত্যাগের অনুশীলনে!

পিনাক-পাণি পিনাক টানি' প্রলয়-স্বর ধ্বনিছে,
আকাশে ঘিরি' বাতাসে ফিরি' প্রলয়-শ্বাস শুনিছে।
অট্টহাসে ভুবন ত্রাসে নিদ্রা গেছে টুটিয়া,
ছাড়িয়া গেহ ভুলিয়া মোহ এসেছে সবে ছুটিয়া।

টুটিয়া বাধা ছিঁড়িয়া বাঁধা ছুটিছে দিক্ বিদিকে,
আঁধার-পথ উজলি' শত প্রেমের দীপে নিমিখে।
নিরাশাহত শ্রবণে কত শুনা'য়ে আশা-কাহিনী,
মুক্তকারা বাঁধন হারা চলেছে আশা-বাহিনী।

জ্বালা'য়ে প্রাণ করিছে দান আলোক ঘোর আধারে
মরণে পুজি' পেয়েছে খুঁজি জীবন মর পাথারে।
বেদনা দিয়া ভরিয়া হিয়া সুখের হাসি হাসিছে
ভুলিয়া হেলা নিঠুর খেলা সবারে ভাল বাসিছে।

ভুলেছে ভয় করেছে জয় মানব-আঁখি-ভ্রূকুটি,
রাজাধিরাজ দিয়াছে সাজ ললাটের জয়-বিভূতি।
শ্মশান-শিখা দীপ্ত লিখা ভাতিছে সব নয়ানে,
বিশ্বজয়ী মহিমময়ী দীপ্তি হাসি বয়ানে।

মিথ্যা আজ পেয়েছে লাজ সত্য-শিব আলোকে,
দ্যুলোক-আলো সেজেছে ভালো আঁধার-মায়া-ভূলোকে।
অশিবনাশী শিবের হাসি ভুবন আলো করিল,
দীপ্তজ্ঞানে সবার প্রাণে মোহের তমো হরিল।

পাগল-খেলা শ্মশান-মেলা ল'য়েছে মন লুটিয়া,
রাজার ছেলে রাজ্য ফেলে শ্মশানে আসে ছুটিয়া।
জ্বালিয়া ভালে দৃপ্তজ্বালে সৃজন-লয়-আরতি
চলেছে হিয়া উন্মাদিয়া পাগল-মহাসারথি।

রেবা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্‌. এ]

১

মাত্র আড়াইবৎসরকাল তার সহিত পরিচয়। আমার একরকম বুড়া বয়েসেই বিয়ে হয়,—তখন আমার বয়স ত্রিশ, আর তার বয়স মাত্র এগার। কিশোরীর সঙ্গে আমার আবার নবীন কিশোর সাজিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমাকে নাকি সত্যই কিশোর বয়স্ক দেখাইত,—কারণ রেবা একদিন বলিয়াছিল—'তুমি কি চিরদিনই এই রকম ছোকরা থাকবে?'

আমাদের বিবাহের পরেই আমি দূরদেশে চাকরী করিতে গিয়াছিলাম। যেখানে কাজ করিতাম, সে যায়গাটা রেল-ষ্টেশনের খুবই কাছে। আর আমার বাংলোটী ছিল মর্ত্ত্যের নন্দন-কানন। সুন্দর নব-নির্ম্মিত একটী ছোট একতলা বাড়ী, সম্মুখে একটী ছোট ফুল-বাগান। আর বাড়ীর পশ্চাতে অনন্তবিস্তৃত মাঠ সেই দামোদরের কূল পর্য্যন্ত গিয়াছে, অনেক দূরে কালো কালো তিনটী ভীষণদর্শন অভ্রংলিহ পাহাড় দেখা যাইত। আমার ঘরের ভিতর দামোদরের প্রাণস্পর্শী বাতাস দিবানিশি বহিত, কর্ম্মের অবসানে শয্যায় শুইয়া আমি সেই সীমাহারা প্রান্তরের দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতাম।

শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলাম বলিয়া আমি প্রথম হইতেই নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীর শাসন খুবই কড়া ছিল, বিশেষতঃ আমার মাতার ও জ্যেঠামহাশয়ের। যদিও সগৌরবে অনেক-গুলা মেডাল-সহ ডাক্তারী পাশ করিয়া ছিলাম, তথাপি আমার হৃদয়ের কাব্যের উৎস শুকাইয়া যায় নাই। ষোলো হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নায়িকাগণ আমার মানসমোহিনী হইয়াছিল। তারপর রেবার মুখ দেখিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম।

ফুলশয্যার সেই নিবিড় গন্ধাঢ্য বাসর-শয্যার কথা মনে করিলে এই প্রৌঢ় বয়সেও যেন আবার নবীনতা ফিরিয়া আসে। সমস্তদিন অভ্যাগত-গণের পরিচর্য্যা করিয়া সুগভীর রাত্রে জ্যেঠামহাশয়ের নিকট হইতে ছুটী পাইলাম। দেহমন তখন বিশ্রাম সুখ প্রার্থনা করিতেছিল। আমার কক্ষের নিকট আসিয়া দেখি—বদ্ধবাতায়ন প্রান্তে কয়েকটী চঞ্চল সকৌতুক মুখ লুকাইয়া 'আড়ি' পাতিয়া আছে। তাহার মধ্যে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কুণ্ডলাও আছে। আমি গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। শ্লথবাসা বধূ নবীনা সখীদের আদরের আতিশয্যে উৎপীড়িতা হইয়া তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে তখন অফুটন্ত ফুলের কুঁড়িমাত্র, আর আমি যৌবনরাজ্য পার হইয়া প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি সকৌতুকে সাদরে তার গোলাপগণ্ডে চুম্বন করিলাম। সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। তার ব্যবহারে বোধ হইল যেন দুজনেই দুজনের কাছে অনেকদিন ধরিয়া পরিচিত।

'রেবা, আমায় চিঠি লিখবে ত?'

'তুমি আগে লিখবে, নইলে আমার লিখতে লজ্জা করবে।'

সেদিনের আলাপ এইরূপেই সাঙ্গ হইল। পরদিন প্রাতেই জ্যেঠামহাশয় বলিলেন, 'সুরেশ, তুমি আজই বিকালে কর্ম্মস্থানে বেরিয়ে পড়। কি জানি, সাহেব যদি কোনো গোলমাল বাঁধায়!'

জ্যেঠামহাশয়ের কথার উপর কথা কহিবার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু তখনও আমার দুইদিন ছুটী মজুত ছিল। আমি যদি থাকিবার ইচ্ছা জানাই, তাহা হইলে হয়ত তিনি মনে করিবেন যে, এরই মধ্যে আমি নবীনা বধূর দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহার মনে এ ধারনা জন্মায়, আমার এমন ইচ্ছা একটুও ছিল না। কারণ এই চারিদিনের ব্যাপারেই আমি

একজন ঘোরতর স্ত্রৈণ কাপুরুষ বলিয়া বাড়ীতে সকলের কাছেই নিন্দিত হইয়াছি। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া সেই দিন বিকালেই বিদেশ-যাত্রা করিলাম। আসিবার সময় শুনিলাম, রেবা কাঁদিতেছে। কিন্তু তাহাকে সান্ত্বনা দিবারও সুযোগ পাইলাম না।—পাছে আবার কেহ কিছু বলে। মাও দেখা করিবার সম্বন্ধে কোনো কথা বলিলেন না। কেবল কুণ্ডলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'ছোড়দা, বউদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?'

কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভাদ্রের বিপুল বন্যা তখন দুই চক্ষু প্লাবন করিয়া ছুটিয়াছে।

২

কর্ম্মস্থানে আসিবার দুই সপ্তাহ পরে আঁকা বাঁকা ছন্দে ঠিকানা লেখা তার পত্র আসিল। সে তখন তার বাপের বাড়ীতে। প্রায় একদিন অন্তর আমাদের পত্রালাপ চলিত। চিঠি লেখালিখির ফলে দুইজনেই দুইজনকে বুঝিতে শিখিলাম। আমার হৃদয় তখন একটী বিকচ কুসুমের মত তরুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ রেবাসুন্দরীকে কেন্দ্র করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই মনে মনে তাহার দাস হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপর রাগ করিতে পারিতাম না। এক বৎসরের মধ্যে যত বারই তার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, কোন বারেই সে রাগ করিবার অবসর দেয় নাই। জোর করিয়া একবার হাতখানি মুঠোর ভিতর হইতে কাড়িয়া লওয়া, একটী ক্রুদ্ধ বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ, নিবিড় পরিরম্ভণ শিথিল করিয়া একবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া—এই সব ছোট ছোট ব্যবহার-গুলিরও বড় বড় কৈফিয়ৎ দিতে হইত, কথা না বলিলেই অমনি গাঢ় কণ্ঠে সজলনেত্রে বালিকার অনুযোগ—'আমায় তা'হলে ত্যাগ করলে? তুমি আমার উপর রাগ করে থাক কিন্তু আমি যে এক মুহূর্ত্তও তোমার উপর মুখ ভার করে থাকতে পারি না।'

এইরূপে আমার হৃদয় তাহারি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ভালবাসার মাত্রা ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবিতাম—সামান্য বালিকা একজন প্রৌঢ়কে এত ভালবাসিতে পারে।

ঘন ঘন পত্রালাপে হৃদয়টা বড়ই কোমল হইয়া গিয়াছিল। একদিন চিঠি পাইতে দেরী হইলে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতাম। সে-সব দিনগুলির কথা মনে পড়িলে এখনও সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। সেই ডাকের সময়

পিয়নের আগমন-প্রতীক্ষায় নয়নময় হইয়া পথেরদিকে চাহিয়া থাকা, তারপর হয়ত অন্যান্য চিঠির মধ্যে তার প্রতীক্ষিত চিঠিখানি না পাইয়া ভগ্নহৃদয়ের একটা করুণ অন্তর্বেদনা, তারপর মানসিক সন্দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে চিঠি আসিলে সকল সন্দেহের অবসান হইত বটে, কিন্তু ভাবিতাম—বালিকা চতুরা হইয়া উঠিতেছে।—আমাকে কষ্ট দিবার জন্যই এই সব কৌশল। আমিও দেরীতে উত্তর দিয়া তার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িতাম না।

রেবা আমাদের বাড়ী আসিতে পত্রালাপ কমিয়া আসিল। কারণ জ্যেঠা-মহাশয় ও মার শাসনশক্তির উদ্যত দণ্ডটার কথা মনে পড়িলে আমার আর চিঠি লিখিতে প্রবৃত্তি হয়না।

দীর্ঘ একবৎসর পরে এইরূপে আমাদের পত্রালাপের ক্ষীণ সম্বন্ধটুকুও একেবারে ঘুচিয়া গেল। প্রথমে বড়ই কষ্ট হইত, কিন্তু কালের অমৃত প্রলেপে কোন কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হইত না, সবই সহিয়া গেল।

অনেকদিন পরে একখানা খুব ক্ষুদ্র চিঠি আসিল। তাহা এই—

"প্রিয়তম, শুধু একবার এসো। অনেক কথা আছে। তুমি যদি আমার অন্তর্য্যামী হও তো কেন ডাকিতেছি বুঝিয়া নিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও ভালবাসা নিও। ইতি তোমারি রেবা।"

মনে বড় কষ্ট হইল। গৃহে যাইবার সময় একটা সুযোগ খুঁজিতে লাগি-লাম। সুযোগ জুটিল।

৩

গভীর রাত্রে দুইজনে বিশ্রমালাপ করিতে ছিলাম।

"কেন, তোমার কিসের কষ্ট আমায় বল।"

"আমার কিছু কষ্ট হয়নি গো,—বড় পেটের অসুখ করতো কিনা, তাইতে রোগা ও কালো হয়ে গেছি। কেন, আর কি পছন্দ হচ্ছে না?"

আমার রাগ হইল। নিদ্রার ছল করিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শেষে একেবারে হুড়মুড় করিয়া আমার বুকের উপর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত পড়িয়া বলিল, "তা হলে আমায় ত্যাগ করলে? আর ও-কথা বলবোনা, এইবারটী আমায় ক্ষমা কর, তোমার পায়ে ধরছি।"

অভিমানের ক্ষুদ্র ঝড়টী কাটিয়া গেলে জানিতে পারিলাম যে আমার অবর্ত্তমানে তাহার উপর নির্য্যাতনের মাত্রাটা খুবই বেশী করিয়া হইয়া গিয়াছে।

সে আর কাহারও উপর রাগিতে জানে না বটে, কিন্তু শৈশবে মাতৃহীনা বলিয়া তীব্র অনুভূতিসম্পন্না ; দুঃখের মাত্রা ভাল করিয়াই অনুভব করিতে পারে। বাড়ীতে কোনও কাজ অসম্পন্ন বা অসম্পূর্ণ থাকিলে তার জন্য দায়ী রেবা। আমাকে চিঠি লিখিলে বাড়িতে বুঝিবে যে স্বামীর কাছে সে অভিযোগ করিতেছে। সুতরাং তিরস্কারের প্রখর জ্বালাটা তাহাকেই দগ্ধ করিত। নীরবে সে সব সহ্য করিতে পারিত, কারণ সে যে মাতৃহীনা।

আমি সব শুনিলাম। গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীগুলিও আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অন্যায় বলিয়া মনে হইত। হিন্দু-সমাজের বজ্র-বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রাণমন বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইত। সাধারণতঃ হিন্দুর গৃহে বধূর অবস্থাটা বিশেষ প্রীতিকর নয়। আমার ক্ষেত্রেও প্রতিবিধানের কোনই উপায় ছিলনা। তাই তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া আবার চলিয়া আসিলাম। দুঃখের অন্ধকারও তার মুখে সরম হাস্যের তরল জ্যোতিঃ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম।

সমস্ত কাজেই আমার উপর তাহার একান্ত একটা নির্ভরশীলতা দেখিতে পাইতাম। আমি যে কাজ অনুমোদন করিতাম না, বা পছন্দ করিতাম না, সে তাহা কখনও করিতে চাহিত না। কোমল-বয়স্কা বলিয়া সে তার কিশোর ধর্ম্ম এখনও ভুলিতে পারি নাই, তাই এত মান-অভিমানের পালা। দ্বিতীয়ার চন্দ্রেরমত তার ছোট কপালতটে চূর্ণকুন্তলের অলস ক্রীড়া, সেই কখনো গম্ভীর, কখনো হাস্যোজ্জ্বল মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্য সেই চম্পকবর্ণনিন্দী সুগৌর করযুগের কোমল আকর্ষণ, সেই কিশোরমুখে যুবতীর মত প্রণয়-নিবেদন সমস্তই আমাকে মুহ্যমান করিয়া রাখিত। আমি অবাক হইয়া শুধু চাহিয়া থাকিতাম। বেশ বুঝিতাম—পরস্পরে পরস্পরের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। আমার বা তাহার উদ্ধারের একটুও উপায় ছিলনা। একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

"একটা কথা বলবো, ঠিক উত্তর দেবে ?"

"এমন কি কথা আছে যা তোমায় এপর্য্যন্ত বলিনি ?"

"আচ্ছা, আমি মরে গেলে আবার বিয়ে করবে ?"

"যদি বলি—হাঁ, তাহলে বিশ্বাস করবে ত ?"

"না।"

"তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে ?"

"কি জানি কেন, হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন কেঁপে উঠলো।"

বাহিরে চৈত্র পূর্ণিমার আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। আমার নিবিড় আদরে তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসিলে মনে হইত—সমস্ত পৃথিবীটা সঙ্গীতের সুকুমার ছন্দে ভরিয়া গিয়াছে। তখন বুঝিতাম—সে এ জগতের নয়। একটা অপার্থিব সুর কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া এই মানব-লীলা ভূমিতে আসিয়া হঠাৎ যেন মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছে।

৪

আর একটী দিনের কথা মনে পড়িতেছে। শুনিলাম সে মরণাপন্ন ব্যাধিতে শয্যাশায়িনী হইয়া আছে। সে আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে। আমি ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম। একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় যখন তার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখন সে একরূপ অচৈতন্য হইয়া আছে। একটী ছিন্ন জীর্ণ শয্যায় সে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া আছে। পার্শ্বে কতকগুলি রজনীগন্ধা ফুল। সমগ্র কক্ষটী যেন একটা প্রশান্ত তৃপ্তির ঘোরে গম্ভীর হইয়া আছে। আমি গিয়া বসিতেই তার মোহের ঘোর কাটিয়া গেল। সে বলিল, "এসেছ? বসো—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ বড় আনন্দ হচ্ছে, এমন আনন্দ কখনো পাইনি। এসো, তোমায় একবার ভাল করিয়া দেখি।"

"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। তোমার ত অসুখ সেরে গেছে।"

অসুখ সারিবার কথা শুনিয়া সে হাসিল। শুধু বলিল, "আমায় নিয়ে তোমরা একদিনের জন্য সুখী হতে পারোনি, এইবার নিজের চোখে দেখে ভাল দেখে বিয়ে করো। বল, আমার এই কথাটা রাখবে?"

"ছিঃ ছিঃ, কি বলছো সব? তুমি একটু ঘুমোও দেখি।"

"ঘুমুবো?—সে একেবারে। আমার শুধু আজ এই দুঃখ হচ্ছে যে আমার জন্য তোমাকে অনেক সইতে হয়েছে। বলো, আমার সব দোষ ক্ষমা করলে? বলো—"

"ও সব কথা বললে আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারবো না। তুমি একটু চোখ বুজে শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

রোগের যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিতে পারা যায় না। শুধু বারবার আমার স্নেহশীতল করতলটী নিজের জ্বর-তপ্ত কপালে দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। নিতান্ত অসহায়ের মত সে একবার আমার ক্রোড়ের মধ্যে তার চুলে-ভরা সুন্দর সমস্ত মাথাটী লুকাইল। যেন সমস্ত জগতের মধ্যে সেইখানেই তার একমাত্র আশ্রয়স্থান। কিন্তু আমাদের

সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রায় পক্ষাহকাল দারুণ রোগযন্ত্রণা সহিয়া সে নীরবে জগতের নিকট হইতে বিদায় লইল। কিন্তু আমার নিকট হইতে তাহার বিদায় লওয়া হয় নাই। জগতে এরূপ ঘটনা ত নিত্যই ঘটিতেছে। কোন্ অজ্ঞাত দেশ হইতে স্বপ্নের মত আসে, আবার কোন্ অজ্ঞেয় রাজ্যে স্বপ্নের মত চলিয়া যায়। তার শেষ স্মৃতি শীঘ্রই আমাদের বাড়ী হইতে মুছিয়া গেল। বিবাহের সহস্র অনুরোধ এড়াইয়া আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

তার জন্য একটুও দুঃখ হইত না আমার। তাহাকে ত একদিনের জন্যও কম ভালবাসি নাই। সুতরাং আক্ষেপ করিবার কিছুই ছিল না। তাই চোখ দিয়া একটুও জল বাহির হইত না। কেবলি সেই মৃত্যু বাসরের পবিত্র শুদ্ধ মুহূর্ত্তটী মনে হইত। সে দিন তাহাকে বলিয়াছিলাম যে তাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে আমার একটুও বিলম্ব হইবে না। নন্দন-লোকের সুন্দর রাজ্য হইতে সে স্নিগ্ধ সজল নেত্রে আমার দিকে এখনও নিশ্চয় চাহিয়া আছে, চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে যে তার শূন্য আসন এখনও শূন্য পড়িয়া আছে, তৃপ্তির ও প্রীতির প্রশান্তগর্ব্বে নিশ্চয়ই তার কিশোর হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, আর সে নিশ্চয়ই এই কথা ভাবিতেছে এখনও তার কাজ সারা হলোনা কেন? আমাকে যে সব দিয়েছিল, সে এখনও কি নিয়ে ধরাধামে বেঁচে আছে?'

কিন্তু ভগবান্ যে মুমূর্ষুকেও বাঁচাইয়া রাখেন!

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেদিনের কথা আজও বেশ মনে পড়ে। ট্রেনের সেই কামরায় কত লোকই যে আমরা একত্র হইয়াছিলাম, কিন্তু সকলকার মনের ভাব কত বিভিন্ন রকমেরই না ছিল। আমরা তিনজন মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতে-ছিলাম বটে, কিন্তু হৃদয়ে কত ভাবেরই না আলোড়ন হইতেছিল। আমি সারাটা পথ ইহাই ভাবিতেছিলাম এই শিখদলের লোকেরা নাজানি কিরূপ ধরণের হইবেন, ইহাঁদের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ; অনেকেরই বয়স শুনিয়াছিলাম

৩০ বা ৩০ এরও উর্দ্ধে, ইহাঁরা সকলে আমায় কিরূপ চক্ষে দেখিবেন, (কারণ আমার বয়স তখন মাত্র ২২ বৎসর ছিল,) আমি গিয়া ইহাঁদের মধ্যে কোনও আমল পাইব কি না, এত বড় উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে কোন্ উপায়ে আমরা সুসংযত করিয়া আমাদের অভীষ্ট সাধন করিব ইত্যাদি শত শত প্রশ্নের আন্দোলনে সারাটা পথ আমার অন্তরে অন্তরে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আনন্দস্রোতও মর্ম্মের অন্তস্তল দিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই বহিয়া যাইতেছিল, মনে হইতেছিল বুঝি এইবার জীবনের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল, যুগ যুগান্তের তিমির বুঝি এইবার অপসারিত হইবে, কিন্তু,—কিন্তু আর একটি কথা ভাবিতেই যেন শঙ্কায় একটু শিহরিয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু বাঙ্গলা আজ কত পশ্চাতে! বাঙ্গলার শত সহস্রবৎসরের কলঙ্ক কালিমা যেন জমাট বাঁধিয়া আমায় প্রতিনিয়তই খোঁচা মারিত। তাই আমার বড় সাধ ছিল বাঙ্গলায় গিয়া কাজ করা, কিন্তু থাক সে কথা।

লুধিয়ানা ছাড়িয়া আর একটি ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। কায়তারসিং "বুলেটিন" নামের একটি সংবাদপত্র কিনিলেন। কাগজে দেখিলাম কলিকাতায় মুসলমানপাড়া লেনে এক ভীষণ বোমার কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। পড়িলাম গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটিসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বসন্তচাটুর্য্যের বাড়ীতে দুই তিনটা বোমা ফেলা হইয়াছে, একজন হেডকনষ্টেবলের পা উড়িয়া গিয়াছে, কয়একজন আহত হইয়াছেন, ঘরের খানিকটা দেয়াল ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, ঘরের ভিতরের অনেক সাজ সরঞ্জাম ছিটকাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে, বাড়ীর সম্মুখের ল্যাম্প-পোষ্ট চুরমার হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু বসন্তবাবু এযাত্রা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। খবর পড়িয়া অনেক কথাই বুঝিতে পারিলাম; পাঞ্জাবের কথা বলা শেষ হইলে বাঙ্গলার তদানীন্তন অবস্থার আলোচনাকালে এ সকল বিষয় যথাযথ ভাবে লিখিব ইচ্ছা আছে।

এই সব বোমা ফাটার ফলে ভারতের চারিদিকে দেশ-ভক্তদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। সকলেই, অন্তত অনেকেই মনে করিত এগুলি এক বিরাট বিপ্লবআয়োজনের বহিঃপ্রকাশ ও ইহার ফলে সকলের মনে ঐরূপ দল গঠনের বাসনা জাগরিত হইত। কায়তারসিং খবরটি পড়িয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কেবল চোখে চোখে চাওয়া চাই-ই হইল, ও পরস্পরের নয়নকোণে আনন্দের এক আভাস পাওয়া গেল। এইরূপে আমরা জলন্ধর ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিলাম। ষ্টেসনে কায়তারসিংএর কয়েকজন ছাত্রবন্ধু অপেক্ষা করিতে

ছিলেন। ইঁহাদের যাহার সহিত যা কথা ছিল হইয়া গেলে আমরা রেলের লাইন পার হইয়া অদূরের এক বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে এই দলের কএকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন ইঁহাদের দেখিয়া মনে একটু ভরসা হইল যে ইঁহাদের মাঝে আমি নেহাত ছেলে মানুষটি হইব না, কারণ ইঁহাদের কাহারও বয়স খুব বেশি বলিয়া মনে হইল না। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কারতার সিং, পৃথ্বী সিং, অমর সিং, রামরাখা ও আরও বোধ হয় কেহ একজন ছিলেন। কারতার সিংএর বয়স তখন ১৯।২০ বৎসরের বেশি হইবে না অমর সিং ও পৃথ্বী সিং দুজনেই রাজপুত তবে বহুদিন যাবৎ পাঞ্জাবেই বসবাস করিতেছিলেন। ইঁহাদেরও বয়স ২৪।২৫এর বেশি বলিয়া মনে হয় নাই। রামরাখা বোধ হয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ইঁহারও বয়স ঐরূপই ছিল। ইঁহারা সকলে রাসবিহারীর সহিত দেখা করিবার আশায়ই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুটি ইহাদের সকলের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি অবশ্য প্রথমে কাহারও নামধাম কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, প্রসঙ্গক্রমে সকলেরই নাম জানিতে পারিয়াছিলাম। আমাদের দলে ঐরূপ অনুসন্ধিৎসাকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম এবং ঐরূপ নামধাম জিজ্ঞাসা করা একবারেই অনাবশ্যক মনে করিতাম। বন্ধুটি এই বলিয়া ইহাদের সহিত পরিচয় করাইলেন যে রাসবিহারী বিশেষ কারণে এখন আসিতে না পারায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ যিনি তাঁহাকেই পাঠাইয়াছেন। কারতার সিং বলিলেন আমরা কিন্তু রাসবিহারীকেই চাই। আমি ইহাদের বুঝাইয়া দিলাম যে এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানকার অবস্থা তিনি ভালরূপ জানিতে চাহেন আর এ ছড়া তিনি এখন এরূপ অবস্থায় আছেন যে আরও কিছুদিন এ দিকে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। পরে আমি ইঁহাদিগকে পাঞ্জাবের সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা কত লোক আছেন, তাঁহারা কিরূপে মেলামেশা দেখাশুনা করেন, তাঁহাদের প্রকৃত নেতা কে ইত্যাদি। আমি বলিলাম "আপনাদের যিনি প্রকৃত নেতা তাঁহার সহিতই আমরা আলাপ পরিচয় করিতে চাই।" অমর সিং বলিলেন "দেখুন আমাদের মধ্যে প্রকৃত নেতার বিশেষ অভাব সেই জন্যই আমরা রাসবিহারীকে চাই, এখানে আমরা যে কয়জন আছি তাঁহাদের কাহারই অভিজ্ঞতা বড় বেশি নাই, সেই জন্যই আমাদের কার্য্যের কোনই শৃঙ্খলা হইতেছে না। আমরা বাঙ্গলার সাহায্য নিতান্তই প্রয়োজন মনে করি; বাঙ্গলা দেশে আপনারা বহুদিন যাবৎ কার্য্য

:করিয়া আসিতেছেন, এসব কার্য্যে আপনাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছে। কারতার সিং ও ইহা স্বীকার করিলেন বটে তবে অমর সিংকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "দেখো ভাই ঐইসে হিম্মত কিঁউ হারতে হো দেখ্‌লে না কামকে ওয়াখত পর তুম হারেই ভিতরসে কিতনে ছিপে হুয়ে রুশতম নিক্‌লেঙ্গে।" অর্থাৎ "কেন ভাই এইরূপ আত্মবিশ্বাস হারাইতেছ, দেখিবে কার্য্যক্ষেত্রে তোমাদের মধ্য হইতেই কত বীর আত্মপ্রকাশ করিবেন।" সেদিনকার সকল কথাবার্ত্তা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বিরাট কার্য্যে তাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ইঁহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে-ছিলেন এবং নিজেদের অন্তরে অন্তরে শক্তির কিছু অভাব বোধ করিয়া বাহিরের একটা অবলম্বন খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মী যদি কেহ থাকেন তো সে কারতার সিং। ইঁহার মধ্যে যেরূপ আত্মবিশ্বাস দেখিয়াছি সেরূপ আত্মবিশ্বাস না থাকিলে কাহারও দ্বারা কোন বড় কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকের মধ্যেই অহঙ্কারের ভাব থাকিলেও এরূপ আত্মবিশ্বাসের ভাব বড় বেশি পাওয়া যায় না। অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস দুইটি পৃথক জিনিষ; অহঙ্কার অন্যকে খোঁচা দেয় কিন্তু যে অহঙ্কার অন্যকে খোঁচা না দিয়া নিজের প্রাণে শক্তির অনুভূতি জাগায় তাহাই আত্মবিশ্বাস।

যাহা হউক ইঁহাদের নিকট পাঞ্জাবের অনেক অবস্থা জানিতে পারিলাম। তাহার অনেক কথাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে ইঁহাদের বিপ্লবায়োজনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন হইল পাঞ্জাবের শিখ সৈন্য। কারতার সিংএর নিকট শুনিলাম যে আমেরিকা প্রাত্যাগত শিখদের সর্ব্ব প্রথম দলেই তিনি এ দেশে আসিয়াছেন এবং সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন ইত্যাদি।

পরে কারতার সিং আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাঙ্গলা দেশে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কতদূর সাহায্য করিতে পারে? বাঙ্গলা দেশে কত হাজার বন্দুক সংগ্রহ হইয়াছে ইত্যাদি।"

আমি বলিলাম "আপনার কি মনে হয়? বাঙ্গলা দেশে কত অস্ত্রশস্ত্র আছে?"

কারতার সিং—"আমরা ত মনে করি বাঙ্গলা দেশ যথেষ্ট অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে কারণ বাঙ্গলা ত বহুদিনযাবৎ এই বিপ্লবায়োজন করিয়া

আসিতেছে এবং আমাদের দলের পরমানন্দের কোন বাঙ্গালী-বন্ধু তাঁহাকে ৫০০ রিভলভার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পরমানন্দ সেই জন্য বাঙ্গলা দেশেই গিয়াছেন।"

আমি—"দেখুন পরমানন্দকে যে কেহ ঐরূপ বলিয়াছেন তিনি কোন বাজে লোক হইবেন। কারণ বাঙ্গলা দেশের কোথাও কেহ ৫০০ রিভলভার বাহির করিতে পারিবেন না। যিনি ঐরূপ বলিয়াছেন তিনি মিথ্যা বলিয়াছেন।"

কারতার সিং—"তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ কিরূপে আমাদের সাহায্য করিবে? বাঙ্গলা দেশেও পঞ্জাবের সাথে সাথেই বিদ্রোহ হইবে কি না? বাঙ্গলা দেশে আপনাদের হাতে কত লোক আছে?" অন্য কোন সময় অন্য কাহাকেও আমরা এ সকল প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতাম না, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তরে বলিতাম "এ সকল বিষয় তোমার জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, ধরিয়া লও কিছুই আয়োজন হয় নাই, তাহা হইলেও এই দলে যোগ দিবে কি না, তোমাকেই সব গোড়া হইতে তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে, এই অবস্থায়ও তোমার এই দলে যোগ দিবার ইচ্ছা হয় কি না? ইত্যাদি।" অবশ্য বাঙ্গলা দেশের কোথাও কোথাও এমনও কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা অনেক মিথ্যা কথা বলিয়া বিপ্লবের বিরাট আয়োজনের মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া দলে লোক সংগ্রহ করিতেন। যাহা হউক কারতার সিং যখন ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন তখন তাঁহাকে উত্তর না দেওয়া সম্ভব হইল না। আমি বলিলাম "দেখুন বাঙ্গলা দেশে যদি আপনাদের মত আমাদেরও সৈনিক বিভাগে ঢুকিবার কোনও সুযোগ থাকিত ত বহুদিন পূর্ব্বেই ভীষণ বিপ্লব হইয়া যাইত। বাঙ্গলা দেশের দল প্রধানতঃ যুবক ও ছাত্রশ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া গঠিত, এবং এই দলে আমরা অতি সন্তর্পণে অনেক বাছাই করিয়া এরূপ লোক লই যাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। কাজে কাজেই আমাদের দলে বহুসংখ্যক লোক নাই; বোধ হয় হাজার দুই এর বেশি হইবে না, তবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যেদিন বিপ্লব প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইবে সেদিন আরও হাজার হাজার লোক আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে। যদি পঞ্জাবে বিপ্লব আরম্ভ হয় ত ইহাও স্থির নিশ্চয় জানিবেন যে বাঙ্গলা দেশ সেদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবে না এবং ইংরাজকে বাঙ্গলা দেশ লইয়াও এমন বিব্রত থাকিতে হইবে যে রাজসরকারের সকল শক্তি পঞ্জাবে কেন্দ্রীভূত হইতে পাইবে না।" আমি ইহাও বলিলাম "বাঙ্গলা দেশ এখনই ট্রেজারী লুট

অথবা পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ ইত্যাদি অনেক কিছুই করিতে পারে, কিন্তু তারি পর? এই তার পর ভাবিয়াই বাঙ্গলা দেশ ওরূপ কিছু এখনও করে নাই। আমি ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইলাম যেন ইহারা আমাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ না করেন। ইহাও বলিলাম "খুব সন্তর্পণে কাজ করিতে হইবে, যেন এত শক্তি ব্যর্থ না হইয়া যায়, শুধু শুধু হই চই করিয়া বাজে কাজে যেন শক্তিক্ষয় না করা হয়।" আমি ইহাদিগকে পরামর্শ দিলাম যেন অধিকাংশ লোককে নিজ নিজ গ্রামে থাকিতে বলা হয়, কেবল নেতৃবর্গও আপাততঃ কাজ চালাইবার জন্য জন কতক লোককে হাতের নিকট রাখা হয়, আর সকলকে যেন কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের উপর এক একজনকে অধিনায়ক করিয়া দেওয়া হয়। তবেই যখন আবশ্যক হইবে তখনই সকলকে পাওয়া যাইবে। এইরূপে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া না পড়েন ত খুব শিঘ্রই সব ধরা পড়িয়া যাইবেন। পরে কারতার সিংকে বলিলাম "আপনাদের মধ্যে কেহ একজন আমার সঙ্গে চলুন আমি তাঁহাকে রাসবিহারী যেখানে আছেন সেখানে লইয়া যাইব। রাসবিহারীর সহিত একসঙ্গে বসিয়া সব ভাল করিয়া পরামর্শ করা যাইবে; ইহাতে ইহারা স্বীকৃত হন এবং ইহাই স্থির হয় যে পৃথ্বি সিংএর সহিত লাহোরে পুনরায় দেখা করিব এবং পরে রাসবিহারীর নিকট যাওয়া ঠিক হইবে।

কারতার সিং আমাদের নিকট কিছু রিভলভার ইত্যাদির সাহায্য চান। আত্মরক্ষা করিবার জন্য ও ছোট খাট ট্রেজারী লুট করিবার জন্য কিছু কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ইহারা যখন আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিলেন তখন নানা স্থান হইতে কতক কতক রিভলভার ইত্যাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ইংরেজের প্রখর দৃষ্টি সত্ত্বেও সে সব রিভলভার দেশে ঢুকিতে পারিয়াছিল। বালতির তলায় একটি কাঠ অথবা টিনের পাত লাগাইয়া তাহার মাঝখানে রিভলভার ইত্যাদি পুরিয়া আনা হইত কিন্তু অল্পদিন পরে রিভলভার আনিবার এই রাস্তাটি ধরা পড়িয়া যায়; আবার অনেক সময় ভারতের বন্দরে পৌছিবার অব্যবহিত পুর্ব্বেই এগুলি খালাসিদের জিম্মায় রাখিয়া আসিয়া পুনরায় অবকাশ ও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের নিকট হইতে লইয়া আসা হইত। এইরূপে কিছু কিছু রিভলভার ইহাদের হাতে আইসে। কিন্তু আরও রিভলবারের প্রয়োজন ছিল। আমরা কাশী হইতে কয়েকটি রিভলভার ও গুলি আনিয়া ছিলাম সে সমুদয় কারতার সিংএর হাতে দিয়া দিলাম এবং বলিয়া দিলাম যা হাতের

গোড়ায় ছিল আনিয়াছি পরে আরও কিছু আনা যাইবে তবে ইহাও জানাইয়া দিলাম যে খুব বেশী অস্ত্র শস্ত্র আমাদের হাতেও নাই সুতরাং যেন তাঁহারা বেশী আশা না করেন।

তবে বোমার বিষয় বলিলাম যে বাঙ্গালী ইহাতে সিদ্ধ হস্ত হইয়াছে এবং যতই আবশ্যক হউক না কেন, ততগুলি বোমাই বাঙ্গলা দেশ যোগাইবে। ইঁহারাও সে সময় এক প্রকারের বোমা তৈয়ারী করিতেন। পাঞ্জাবে শীশার ও পিতলের একরূপ দোয়াত পাওয়া যাইত এই দোয়াত ছিল ইঁহাদের বোমার খোল। এই সব দোয়াতের মুখে প্যাঁচ ছিল, দোয়াতের ঢাকনা আটিয়া দিলে বেশ ভালরূপেই বন্ধ হইয়া যাইত। আর ইঁহাদের মসলা ছিল তুমি পটকার যাহা উপাদান তাহাই, অর্থাৎ পটাশ (ক্লোরেট অব্) ও মোমছাল। আর কাচের একরূপ অতি সূক্ষ্ম শিশি পাওয়া যাইত; ইহাও দেশী তৈয়ারী; ইহারই মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড্ পুরিয়া ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া খোলের মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইত; সামান্য আঘাতেই ইহা ভাঙ্গিয়া যাইত অনেক সময় বোধ হয় এই মসলার সহিত চিনিও দেওয়া হইত শিশি ভাঙ্গিয়া যাইলে এ্যাসিড্ পোটাস্ ও চিনির সংযোগে ঐ বোমা ফাটিত ও দোয়াতের টুকরা চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িত। এই বোমা তেমন মারাত্মক ধরণের ছিল না, অনেক সময় মোটেই ফাটিত না, ফাটিলেও মানুষ বড় একটা ইহাতে মরিত না। আমি ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে বাঙ্গলার বোমা বড় সাংঘাতিক জিনিষ। কারতার সিংকে বলিলাম যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে আমাদের কতক কতক বোমা রাখা আছে তাঁহারা চান ত দিতে পারি। কারতার সিং সাগ্রহে লইতে প্রস্তুত হওয়ায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার পর তাঁহার সহিত কোথায় দেখা হইবে। উত্তরে তিনি বলিলেন আমি কোথায় থাকিব তাহার কিছুই ঠিক্ নাই। ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের কি কোন কেন্দ্র নাই যেখানে যাইলে সকল খোঁজ পাওয়া যাইবে?" উত্তরে শুনিলাম, না। শুনিলাম ইহারা সকলে বিভিন্ন কাজে চলিয়া যাইবেন, কাজ হইয়া গেলে পুনরায় একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হইবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ এইরূপে মিলিত হইতে না পারেন তখন গুরুদ্বারায় খোঁজ করা ভিন্ন অনুসন্ধানের আর অন্য উপায় থাকে না। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ভাবিলাম হয়ত আমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করা হইতেছে না। তাই আমাদের অভ্যাস মত আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না আর এর উপর

কোন পরামর্শও দিলাম না। পরে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে জানিয়াছিলাম যে সত্যই ইঁহাদের এইরূপই অবস্থা এবং তখন তার প্রতিকারও করিয়াছিলাম। এই বাগানে যেখানে কথাবার্ত্তা হইতেছিল সেখানে প্রথমে আসিয়াই আমার মনে হয় যে জলন্ধরে ইঁহাদের বিশেষ কোন আস্তানা নাই, যাঁহারা এখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই জলন্ধরের বাহির হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, আর এখানে ইঁহাদের এমন কোন আড্ডা ছিল না যেখানে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারি। এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ইঁহারা রাসবিহারীকে আনিতে চাহিয়াছিলেন। যাহাকে ধরিবার জন্য—সে সময় ৭৫০০৲টাকা সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই সব কথা শুনিয়া কারতার সিংকে পরের দিন কোন একটি স্থানে যাইতে বলিলাম, কারতার সিং স্বীকৃত হন। স্থির হইল সেই ষ্টেসনে আসিয়া তাঁহাকে আমি লইয়া যাইব এবং তাঁহার হাতে আমাদের সংরক্ষিত বোমাগুলি দিয়া দিব।

ঘড়ি দেখা গেল, যে যাঁহার কাজে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহাদের ট্রেনের সময় হইয়া আসিয়াছে। আমিও আমার বন্ধুটী একটি হোটেলে গেলাম। দেখিলাম বন্ধুটি মৎস্য মাংস কিছুই স্পর্শ করেন না অগত্যা আমায়ও সে যাত্রা ডাল ভাজিতেই তৃপ্ত হইতে হইল। পাঞ্জাবের তন্দুরের রোটি ও ডাল কিন্তু একটি উপাদেয় জিনিষ (তন্দুর পাঞ্জাবের একপ্রকার উনান)।

আমিও পূর্ব্বে মাছ মাংস কিছুই খাইতাম না, আর কতবার যে এইরূপ খাওয়া ছাড়িয়াছি ও ধরিয়াছি তাহাও বলিতে পারি না। আরও কিছু পূর্ব্বের কথা—একবার হরিদ্বার হইতে লাক্সার জংসনে আসিয়া রাসবিহারীর জন্য (আমরা ইঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম) অপেক্ষা করিতেছি। তিনি বিকালের গাড়ীতে আসিবেন। লাক্সারে একটি ভাল রিফেসমেণ্ট-রুম ছিল আমি হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া রিফ্রেসমেণ্ট রুমে গেলাম। কি চাই বলিতেই "রোটি আর তরকারি লেয়াও" হুকুম করিলাম। পশ্চিমের সুন্দর সুন্দর রুটিও—ওকি,—দেখি মাংস লইয়া আসিয়াছে। তখন জানিতাম না যে তরকারি মানে পাঞ্জাবী ভাষায় মাংস। কি করি বড় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। এখন ফিরাইয়াই বা দি কেমন করিয়া, ইহারাই বা কি মনে করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া খাওয়াই স্থির করিলাম। পুনরায় যখন বিকালে রাশুদার সহিত খাইতে বসিলাম, তিনিও রুটি মাংস ফরমাস করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই

আমার দিকে তাকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—ও তুমিত মাংস খাবে না বলিয়াই আর একটা হুকুম করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আমি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম, থাক্ থাক্ যা আসছে আসুক এবং পরে সকালের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলাম সকালে খাইয়াছি এখন না খাইলে নিতান্ত ভণ্ডামি করা হইবে। রাশুদা কিন্তু বলিলেন "দেখো ভাই, যেন ইহাতে মনে কোন রূপ গ্লানি না হয়।" সেদিন হইতে পুনরায় মাংস খাওয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাংস খাই আর নাই খাই এবং বোমা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও আমরা নিতান্ত মাংসাশী জীব ছিলাম না।

যাহা হউক তন্দুরের রুটী ও ডাল খাওয়া হইলে পরিতৃপ্ত ভোজনের পর শারীরিক স্বরাজ লাভ করিয়া আমি কারতার সিংএর বোমা সংগ্রহের জন্য একদিকে চলিয়া গেলাম এবং আমার সঙ্গী বন্ধুটি লাহোরের দিকে রওয়ানা হইলেন। আমি গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া নিজেদের আস্তানায় গেলাম। এইখানে আমাদের যে লোকটি ছিলেন তাহার কাছে অবশ্য আমি পূর্ব্বোক্ত কোন কথাই ভাঙ্গি নাই কেবল এইটুকু বলিলাম যে বোমাগুলি আমার চাই, একটি শিখ্ আসিবেন তিনি সেগুলি লইয়া যাইবেন। শিখের নাম শুনিয়া তিনি একটু বিচলিত হইলেন, বলিলেন দেখিবেন শিখদিগের সহিত একটু সাবধানে মিশিবেন, শিখ্দিগের উপর সরকারের আজকাল বড় কড়া নজর ওদের সঙ্গে এখন মেশামেশি না করিলেই ভাল হয়। আমি মনে মনে ভাবিলাম সর্ব্বনাশ একে তো আর বিশ্বাস করা যায় না, ঘাক এর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। মুখে তাঁহার কথায় শায় দিয়া নির্দ্ধারিত সময় ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যথা সময়ে ট্রেন আসিল, কিন্তু কারতার সিংকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সারা ট্রেণ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম কোথাও পাইলাম না, আর একটি ট্রেণের সময়ও দেখিলাম সে ট্রেণেও পাইলাম না। সারা ষ্টেসন খুজিলাম কত লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম কিন্তু কাহারও মুখ কারতার সিংহের মুখের সহিত মিলিল না। অগত্যা বাসায় ফিরিলাম পুনরায় যে কারতার সিংএর কোথায় দেখা পাইব তাহা আমিত জানিতামই না ইহাদের দলেরও কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। যেখানকার বোমা সেইখানেই রহিল আমি লাহোর চলিয়া গেলাম। লাহোরে পূর্ব্ব পরিচিতদের সহিত দেখা শুনা করিয়া ইহাদের নিকট হইতেও পাঞ্জাবের খবর লইবার চেষ্টা করিলাম। এইরূপে বিভিন্ন সূত্র হইতে নানারূপে যাহা সংগ্রহ

করিলাম তাহার অনেক কথা আপনাদের বলিয়াছি। সন্ধ্যাবেলা লাহোরে একটি প্রকাশ্যস্থানে পৃথ্বীসিং আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাকে করতার সিং এর কথা বলিলাম। অবশ্য তিনিও তাঁহার কোন খোঁজ দিতে পারিলেন না, কাশী যাওয়ার কথায় তিনি বলিলেন যে আরও দিন তিন চারের মধ্যে যাইতে পারিবেন না। স্থির হয় ৫ই ডিসেম্বর :পাঞ্জাব মেলে কাশী যাইয়া পৌঁছিবেন। পরে তাঁহাকে আমি রাসবিহারী যেখানে ছিলেন সেখানে লইয়া যাইব, রাসবিহারী যে ঠিক কোথায় আছেন তাহা আমি ইহাদের নিকট তখনও কিছু প্রকাশ করি নাই। (ক্রমশঃ)

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩১)

পত্র হাতে বাহিরে আসিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"এ-পত্র সে কাকে দিতে বলেছে রে?"

"আপনার হাতে দিতে বলেছে।"

"তোর মাকে দিতে বলেনি?"

"মার কথা সে তোলেই নি। কেন, বেটি মার সম্বন্ধে কিছু চিঠিতে লিখেছে নাকি?"

"না—আপাততঃ তোর কাজকর্ম্ম যা করবার আছে সেরে নে। হয়ত সেখানে তোকে আর একবার পাঠাবার দরকার হবে।"

মনিবকে তামাক দেওয়া যে প্রথম ও প্রধান কাজ তারই ব্যবস্থা করিতে হেমা চলিয়া যাইতেই ব্রজেন্দ্র ইজি চেয়ারে শুইয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল।

"তোমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা নাই, তবু তোমাকেই লিখছি। শুনেছিলুম আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছা হ'য়েছিল। তোমার স্বামীর মুখে তোমার গুণের কথা শুনে আমারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

বিধাতার ইচ্ছায় সেটা ঘটে ওঠেনি। আর এ চিঠিখানা পড়ে বুঝবে সত্য সত্যই বিধাতার ইচ্ছা ছিল না তোমাতে আমাতে দেখাশুনা হয়। আমি, বড় তাড়াতাড়ি যা মনে আস্‌ছে লিখছি, কিছু মনে করনা ভাই—কেন তা এখনি বুঝতে পারবে। মনের যে অবস্থায় লিখছি কেমন করে কলম ধরেছি এটা ভাবলে ও তুমি আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারবে না।

বললে তুমি রাগ করনা, তুমি সাধ্বী, তোমার স্বামীর মুখে শুনেই তোমাকে বলছি, আর তোমার মত সাধ্বীকে ত্যাগ করে যে পরদারাসক্ত হতে পারে, আমি নিজে হীন হলেও তাকে বলবার আমার অধিকার আছে ব'লে বলছি। তোমার সেই ঝুঁটা মাণিকটির জন্ত আজ সন্ধেবেলা থেকে আমি একরকম ঘর-বার করছিলুম, এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে চোরটির মত সে সদর দরজার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঝড় আর অন্ধকার। পা টিপেটিপে তাকে ধরতে গিয়ে—এত বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বোধ হয় আর কখনও শোননি, শুনেও হয়ত তুমি প্রত্যয় যাবে না। তোমার সেই ঝুঁটা মাণিকটির বদলে দেখি আসল মাণিক আমার পায়ে ঠেকেছে। একথা বেশী বলছি না ভাই পায়েই ঠেকেছে। বারো বৎসর পরে তার অপমানের যে টুকু বাকি ছিল সে টুকু কড়ায় গণ্ডায় তাকে চুকিয়ে দিয়েছি। হায়! সে যদি আমাকে চিনতে পারে তার লাথীতে আমার দাঁত কটা ভেঙে আমার লাথীর জবাব দিয়ে চলে যেতো! কিন্তু সে যায়নি, আমি যেতে দিইনি, তার পায়ে ধরে অনেক করে ঘরে এনেছি।

পূর্ব্বের বালক যুবা হয়েছে ;—কিছু পরিবর্ত্তন, তবু আমি তাকে দেখামাত্র চিন্‌লুম। কিন্তু সে চিনতে পারলে না। এখনও পারেনি, বুঝি পারবে না। আজ আমার গৃহ প্রবেশের দিন—সে আজ আমার ঘরে কোন্ বিধাতার কি লিখনে বামুন হতে এসেছে—তার সুমুখে সাধ্বী এক ঘটি জল পর্য্যন্ত ধরতে আমার সাহস হচ্চে না—বুঝি তাও সে খাবে না।

তোমার স্বামী আসতে পারেনি সে একরকম ভালই হয়েছে। হেমাকে ভিতরে আসতে দিয়েছি, তাঁকে দিতুম না। এসে সারারাত তাঁকে আমার সদর দোর আগলে থাকতে হ'ত। এ প্রচণ্ড ঝড় নিজে ওকালতী করলেও আমার ঘরে তাঁর স্থান হ'ত না।

হেমা তাঁর চিঠি এনে আমাকে দেখিয়েছে। তিনি যা লিখেছেন তার একটিও আমি বিশ্বাস করিনি। হয় তিনি ঝড়ে আস্‌তে সাহস করেন নি, নয়

তুমি তাঁকে কোনও মতে আসতে দাও নি। না দিয়ে ভালই করেছ! কিছু মনে ক'রনা ভাই, আলাপ পরিচয় যা কিছু করবার তা এই চিঠি দিয়েই করা গেল। কোথায় বুঝি সে পয়সার জন্যে গিয়েছিল, ঘুরে বুঝি ক্লান্ত হয়েছিল, একটুখানি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমাকে দেখিয়েছি।

সাধ্বী, তোমার শোনা উচিত নয় ব'লে এ পাপিষ্ঠা কুলত্যাগিনীর কাহিনী তোমাকে শোনালুম না। তবে, যখন ছিল, তখন আমার কুল তোমাদেরই মত উজ্জ্বল ছিল। আমার স্বামী তোমাদেরই পাল্‌টি ঘর। তবে সে বড় গরীব, কিন্তু আমি? কালই যে সুদ আনতে তোমার স্বামীর হাতে পনর হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়েছি। আর তার গায়ে যখন পা ঠেকিয়েছি, তখন আমার গায়ে অন্ততঃ দুহাজার টাকার অলঙ্কার।

ইচ্ছা নয় এ চিঠি তিনি দেখেন, কেননা কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমার দরকার—বিশেষ দরকার। তবে যদিই তুমি তাঁকে দেখাও, আর এ চিঠি দেখে যদি এখানে আসতে তাঁর সাহস না হয়, তা হ'লেও আমার মাথার দিব্যি দিয়ে শেষবারের মত, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে ব'ল। তাতেও যদি তিনি আসতে না চান, তা হ'লে ও' কাগজ কখানা আমাকে ফিরিয়ে দিবার তাঁর আর প্রয়োজন নেই। ও সমস্ত টাকা, ভাই আমি নালু বাবুকে দান করলুম। ইতি

শ্রীমতী——

হায় স্বামীর নামেই অভাগিনীর নাম ছিল।

পুঃ যদি কাউকে এ কথা জানাও একমাত্র তোমার স্বামীকে জানাইতে পার। মাথা খাও, যেন তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানিতে না পারে। আমি নির্লজ্জ, সুতরাং এ কথা জানিলে আমার আর কি ক্ষতি হবে—শুধু সেই গরীব ব্রাহ্মণটির জন্যই বলছি।

চিঠিপড়া শেষ করিয়াই ব্রজেন্দ্র চোখ বুজিল, মুক্তদৃষ্টিতে পাছে নিজের মসীরেখাঙ্কিত মুখখানা দৈবযোগে দেখিতে পাইয়া সে শিহরিয়া উঠে। হেমা গড়গড়া লইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিল। মনে করিল, বাবু ঘুমাইয়াছে। সে ডাকিল—"বাবু!"

চোখ বুজিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিলেন—"গড়গড়া রেখে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।"

ঠিক এমনি সময়ে ঝি সরি সেখানে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

"বাবু! মা জানতে পাঠিয়ে দিলে ভট্টাচাজ্জি মশাই আজও যদি না আসেন, তা হলে নারায়ণ পুজোর কি হবে?"

"আমাকেই করতে হবে।"

হেমা আবার বলিল—"সত্যি সত্যি তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না বাবু!"

ব্রজেন্দ্র উত্তর না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

চোখের উপর যা দেখছি সব কথা কি আপনাকে বলতে পারি!

এবারেও মনিবের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না দেখিয়া, কথার উপর একটু অভিনয়ের সুর দিয়া যেমন সে বলিল—"সেই সোফার উপর দুজনে—কি আপনাকে বলিব বাবু—"

"থাম্‌না হারামজাদা, চিঠি লিখ্‌তে দে।"

সরি ছুটিয়া পলাইল, হেমাও এবার বুঝিল, বাবুর প্রাণে বড়ই দাগা লাগিয়াছে। সুতরাং আর সে কোনও কথা কওয়া ভাল বোধ করিল না, কেননা বলিলেই বাবুর মেজাজ এইরূপ দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিবে।

ব্রজেন্দ্র লিখিল—"নির্ম্মলা তোমার পত্র আমাকে দেখাইয়াছে। বুঝিলাম, যে কথা গুলা আমার সম্বন্ধে তুমি পত্রে লিখিয়াছ, সেগুলা আমাকে বরাবর বলিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়ায় তুমি পত্রখানা আমার স্ত্রীর নামে পাঠাইয়াছ। পত্রে আমাকে বেশী কিছু বল নাই, বরং আরও একটু জোর করিয়া আমাকে শঠ প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুচারিটি খাঁটি কথা বলিতে পারিলেই ঠিক বলা হইত। পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। শুধু তাই নয়, নিজেকে এমনি হীন বোধ হইতেছে যে, তোমার সুমুখে উপস্থিত হওয়া পরের কথা চিঠি লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি। তবু তুমি যখন যাইতে লিখিয়াছ, তখন একবার যাইব। যদি আমার দ্বারা তোমার কোনও কিছু সাহায্য হইবার প্রত্যাশা কর, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। আদালতে আজ আমার বিশেষ কাজ আছে—যেরূপ দুর্য্যোগ এখনও রহিয়াছে, তাহাতে সকাল সকাল আফিসে যাওয়া বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আফিস হইতে ফিরিবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

পোনেরো হাজার টাকা নালুবাবুকে দিবার প্রয়োজন নাই। বরং তাহা তোমার স্বামীকে দিলে আমি বেশী সুখী হইব।

আগে তোমার কি নাম ছিল পত্র পড়িয়াও ঠিক জানিতে পারিলাম না। বলিয়া শিরোনামা দিলাম না। তোমার স্বামীর নাম ত রাখহরি—তার কি আর কোনও নাম আছে?"

অনুতপ্ত ব্রজেন্দ্র।

চিঠি খামে মুড়িয়া হেমার হাতে দিতে গিয়া, ব্রজেন্দ্র বলিল—"যদি বামুনকে সেখানে দেখতে পাস্, কোনও কথা তাকে বলিস্‌নি।"

"আমার বলবার দরকার কি বাবু!"

"দরকার থাক্ আর—না থাক্, শোন আমি যা বলছি।"

"আমি তার দিকে চেয়েও দেখবো না।"

"চেয়ে দেখবিনি কেন?"

"কি জানি, দেখলে বাবু, কোন্ দিক থেকে কার আবার রাগ হবে।"

দুষ্ট ভৃত্যটার কথার ভাবে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্রের ক্রোধ হইল, তথাপি সে আপনাকে যথেষ্ট সংযত করিয়া, চিঠির খামখানা পরীক্ষার ছলে মুখ নামাইয়াই বলিল—"আর কারও হোক না হোক আমার হবে। এমন কি পথে যদি দেখা হয়—"

"মুখ ফিরিয়ে চলে যাব।"

"কথা শেষ করতে যদি না দিস্, জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

ঠিক এমনি সময়ে নির্ম্মলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল -"কেন গরীব কি অপরাধ করলে যে জুতো মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দেবে?"

হেমা বাবুর বাক্যের জুতা ইতিপূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে, সুতরাং সে ইহাতে দুঃখ ক্রোধের কিছুমাত্র নিদর্শন না দেখাইয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কথার কোনও উত্তর না দিয়া হেমার হাতে চিঠি দিয়া বলিল—"যা, এই চিঠিখানা দিয়ে আয়। দিয়েই চলে আস্‌বি, দেরি করবিনি।"

নির্ম্মলা বলিল—"কাকে?"

হেমা বাবুর মুখের পানে চাহিল। ব্রজেন্দ্রও কিছু অপ্রতিভের মত হইল; সত্যই ত চিঠি যে কাকে দিতে হইবে সে ত এ পর্য্যন্ত হেমাকে বলে নাই।

নির্ম্মলা হেমার হাত হইতে চিঠি লইয়া দেখিল তাতে শিরোনাম নাই। যদিও চিঠি কার এটা নির্ম্মলা কিম্বা হেমা কারও বুঝিতে বাকি ছিল না, তবু নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—

"এ চিঠি কাকে দিতে যাচ্ছিস্‌রে হেমা ?"

হেমা বলিল—"বাবু জানে"।

"তোকে এখন চিঠি দিতে হবে না। হালদার বাড়ী গিয়ে ঠাকুর পূজোর একজন বামুন ডেকে আন্, যদি ভট্টচার্জ্জিমশাই না আসে, তাহ'লে পূজো হবে না।"

"কেন, সরি তোমাকে গিয়ে কিছু বলেনি ?"

"সরি ত বলেছে। তুমি তোমার মত বলেছ, আমাকে ত আমার মতন করতে হবে। যা হেমা দেরি করিস্‌নি, চিঠি এসে দিলেও চল্‌বে, কিন্তু বামুন না এলে একেবারেই চলবে না, মা ও আমি মুখে জল দিতে পারবো না, বঝেছিস্ ?"

হেমা চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র বলিল—"কেন, আমার পূজো কি তোমাদের পছন্দ হবে না ?"

"তুমি পণ্ডিত মানুষ, মন্ত্র তন্ত্র সব জানতে পার, কিন্তু বামুনকে যদি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে কোন্ সাহসে ছুঁতে যাও ; ঠাকুর কি তোমার বাড়ীর খানসামা না কি ? না পাঁচটা পাশ করে টোরনি হয়েছ ব'লে তোমার কোন কাজ আটকায় না ?" বলিয়াই নির্ম্মলা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। ব্রজেন্দ্রের কোনও কথার অপেক্ষা করিল না।

"দেখো যেন চিঠিখানা শুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলো না।"

নির্ম্মলা চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল—"তোমার উপর রাগ আর করবো না মনে করেছিলুম, কিন্তু চিঠি পড়ে সত্য সত্যই তোমার উপর আবার রাগ হ'ল। তুমি শঠ প্রবঞ্চক হ'লে কিসে ? আর সে মাগী তোমাকে ঝুঁটো বলেছে বলেই তুমি ঝুঁটো হ'য়ে গেলে ? তাই এ চিঠি সেই বেশ্যা বেটীকে লিখে পাঠাচ্ছ। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই।" বলিয়াই সে চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"তা হ'লে চিঠি তাকে দেবো না ?"

"চিঠিত দেবেই না, যাবেও না। হ্যাঁ, তবে একখানা চিঠি তাকে লিখতে পার, আর যাব না বলে। আস্পর্দ্ধার কথা দেখ একবারে ময়লার হাড়ী, বেটী

কিনা বলে তোমায় ঝুটা মাণিক। তোমাকে সে লিখতো, আমি না জানতুম, সে হ'ত এক আলাদা কথা। একটু ধুলো কাদা লেগে উজ্জ্বল রত্ন কিছু মলিন হয়েছে উজ্জ্বল হ'তে কতক্ষণ! তবে টাকা কটার কথা যা লিখেছ, তা ঠিক লিখেছ—রাম রাম! তার দান আমার নালু কেন নিতে যাবে?"

"সেই ভাল, যাবনা বলেই একখানা চিঠি লিখে দেবো। এরকম খবর পেয়ে আর সেখানে যাওয়া আমার উচিত হয় না।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

নির্ম্মলা বলিল—"তবে যদি সে নিজে সাহায্য চাইতে তোমার বাড়ীতে আসে তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা।"

"তা কি সে পার্ব্বে নির্ম্মলা?"

"দেখাই যাক্ না। তুমি স্থির থাকতে পারলেই হ'ল।"

"আমি স্থির থাকব, স্থির জেনে রাখ।"

"তবে সকাল সকাল স্নান সের ফেল। রাত্রে ঘুমুতে পারনি, না নাইলে অসুখ করবে!"

অন্যদিন হইলে নির্ম্মলার ছেলে মেয়ে ঘুম হইতে উঠিয়া এতক্ষণ বাড়ীতে কোলাহল তুলিয়া বসিত, আজ এখনও তাহারা উঠে নাই, কিন্তু আর তাদের উঠিতেও বড় বিলম্ব নাই। নির্ম্মলা বাহির বাটীতে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় জানিয়া, ব্রজেন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া চিঠির ছিন্নাংশগুলা কুড়াইয়া নীরবে ছেঁড়া কাগজের চুবড়ীর ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একবার কেবল ব্রজেন্দ্রের গৃহত্যাগের সময় বলিল, তবে চারু তাহার স্বামী সম্বন্ধে যে কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছে, তাহা উভয়কেই পালন করিতে হইবে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে যাইবার জন্য ব্রজেন্দ্র সবেমাত্র সিঁড়ির মাথার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় হেমা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল পুরুতঠাকুর আসিতেছে। এরূপ মনিব হইয়াও নিতান্ত অপরাধীর মত ব্রজেন্দ্র তাহার বেতনভোগী দরিদ্র রাখুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইল না। আবার একবার তামাক খাইবার অছিলা করিয়া ত্রস্ত পদে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলা ঘরটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বাহিরে আসিতেছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"ফিরিলে যে?"

ব্রজেন্দ্রকে আর উত্তর দিতে হইল না, বাহিরে আসিবার জন্য চৌকাটে পা দিতেই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল রাখু সিঁড়িবাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

(ক্রমশঃ)

স্বদেশ-বোধন

(শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত)

আজকে আমার স্বদেশ জুড়ে প্লাবন জেগেছে
প্লাবন ওরে মাতন ওরে পরাণ মেতেছে।
কোন্ নিভৃতে দুঃখ-ঘায়ে জাগ্‌ল ওরে প্রাণ
আজ সে মহা ঝড়ের মত বইছে বেগবান,
বইছে হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র শাসনে
ঘূর্ণীচাপে চূর্ণ করে শাসক-পীড়নে।
বন্দীবীর-মৌন-বলে বন্দীর অপমান
শক্তি-পশু খর্ব্ব নত ক্ষুব্ধ হতমান।

*　　*　　*

আমার দেশে বেদন-বাসে সুখের ভিটাতে
সুধামৃত-সঞ্জীবনী লক্ষ ধারাতে
লক্ষ প্রাণে জাগিয়ে দিল দৃপ্ত সুমহান
নির্য্যাতনে চরণ-তলে দলছে বলীয়ান।
সত্যে তারা সার বুঝেছে ধর্ম্মে রাখে মন
হিংসা দূরে দূর করেছে, মান্‌ছে না পেষণ;
ভয় জিনেছে, ক্লেশ মানে না, দর্প ভাঙে বীর,
অত্যাচারে বক্ষে লহে সৌম্য তেজী ধীর।
অত্যাচারও নির্য্যাতন নদীর যেন জল
তাদের বক্ষ গিরির পরে আছ্‌ড়ে কলকল

চূর্ণ হয়ে ফির্‌ছে পুন, নয় গিরি চঞ্চল ;—
প্রহ্লাদ সে লক্ষ যেন মৌন অবিকল
সত্যে আপন আঁকড়ে লয়ে হাস্যে বরে দুখ
বিজয়ী প্রাণ গুপ্ত জয়ে ফুলিয়ে রাখে বুক।

*   *   *

আজ্‌কে আমার দেশের পরে শাসক-ফেরুদল
লক্ষ বীরসিংহ পিছে কর্‌ছে কোলাহল,
সিংহ চলে দম্ভভরে শক্ত চরণে
ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ নাই ক্ষুদ্র কথনে।
সত্য কাছে তুচ্ছ দেহ নির্য্যাতন ও ক্ষীণ,
অত্যাচারে অন্তরে কি কর্‌তে পারে হীন ?
দুখের ঘায়ে বেদন-ঘায়ে আলস্ টুটেছে
দেশ-সেবকের আত্মা আজি অজয় হয়েছে।
অত্যাচারী পীড়ন করে পেষণ অবিরাম—
দুখের দাগ কিছু নাহি, ফুল্ল অফুরাণ
লক্ষ বীরে সইছে ধীরে সকল বেদনায়
বাত্যামুখে বজ্রভরা মেঘের গতি প্রায়।
অত্যাচারী অবাক মানে—নীরব নীতি আজ
রক্তলোভী শক্তি তারি খর্ব্বে দিয়ে লাজ।
উদ্যত তার অস্ত্র আজি নুইয়ে পড়িছে
আত্মনীতি ক্ষাত্রনীতি আজকে জিনিছে।

*   *   *

দেশ জেগেছে প্রাণ জেগেছে শক্তি জাগরূক
বিপদ জিনে আন্‌তে বিজয় আজ সবে উন্মুখ ;
জাগ্‌ল কুলী জাগ্‌ল মেথর জাগ্‌ল যারা দীন
মুছ্‌বে আত্ম-অপমানে, থাক্‌বে কেন হীন ?
বল্[illegible] রা—গান্ধীকি জয়, জয় ভারতমাতা
মুক্তি চাহি, মোদের ঘরে আমরা মোদের ধাতা ;

কর্‌বে না কাজ নকৃরি সেবা, অগ্রে চাহে মান,
তাদের স্বাধীন কর্ম্মে কেহ কর্ব্বে না হাত দান।
দেশ-নেতা যায় কারাগারে, ছাত্র তারি পিছে
তার পিছনে বালক ছুটে, বল্‌ছে বাঁচা মিছে
দেশ যদি না স্বাধীন হল, বিচার-দিনে বলে
জরিমানা নাহি দিব, পিতায় দিলে পরে
নই সে পিতার তনয় আমি। এম্‌নি ভয় হীন
জাগল যুবা, বৃদ্ধ, শিশু আর কে পরাধীন?
মন ভেগেছে মুক্ত হাওয়ায় মুক্তিপথে রে,
কিসের বাধা?—শাসক বাধা? ভাঙতে হবে যে।

• • •

পুরাঙ্গনা ঘর ছেড়ে আজ সন্তানেরে লয়ে
দেশের তরে সকল দুঃখ মাথার পরে বহে,
মাতা ত্যজেন স্নেহের নীড়ে, ভগ্নী ভ্রাতা ছেড়ে
পত্নী স্বামী সোহাগ ত্যজি আজকে পথে ফেরে,
পর্‌তে বলেন দেশের মোটা সুতোয় বোনা বাস,
দেশকে মনে রাখতে আসে, নিজের পরে আশ।
আলাদিনের অত্যাচারে চিতোর পুরাঙ্গনা
আজকে যেন পুড়তে আসেন দৃপ্তা মহামনা।
আজকে পথে মাকে দেখে ভগ্নীকে আজ দেখে
কে রবে রে অলস ভীরু ঘরেতে মুখ ঢেকে?—
আজকে যেরে ডাক এসেছে দেশমাতারি ডাক
সে ডাক বুকে বুকে গিয়ে বাজায় যেন শাঁখ।
সেবাব্রতে স্বরাজব্রতে পূজায় জাগা প্রাণ,
দীন ভারতের মুছিয়ে আঁখি গৌরব কর দান।
আজো যারা পিছিয়ে আছিস্ আয়রে চলে আয়
কাতর দেশমাতা যে তোর মুখের পানে চায়।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ—

(১) স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-চারটী কথা।

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

মেয়েদের এই বিবিয়ানীর নেশা কাটাইতে হইবে। এই সর্ব্বনেশে মৌতাত ছাড়াইবার প্রধান উপায় ধর্ম্ম-চর্চ্চা! স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ব্যতীত কি স্ত্রী-পুরুষ কাহারও চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেই পারে না। জ্ঞানব্যতীত সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয় না। আধুনিক মতে যে ইংরাজের সর্ব্বপ্রকার অনুকরণেই চিত্ত-বৃত্তির প্রসারতালাভের উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ইংরাজের ধর্ম্মনীতি অথবা রাজনীতি এবং সমাজনীতিও যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সঙ্কীর্ণ রূপেই সংস্থিত, তাহা ইংরাজ চরিত্রাভিজ্ঞ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণের সহিত আলাপে এবং তাঁহাদের লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে অনেকেই জানিতে পারেন। আমি এখানে একটী শ্রুত কথার উল্লেখ করিলাম। এক সময়ে মেহেরপুরে চাকরী করার সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কুক্ এবং আমার পূজনীয় পিতৃদের একটা গরমের দিনে কি একটা মোকর্দ্দমার তদারকে গিয়াছিলেন। অনেক ক্রোশ পথ ঘোড়া ছুটাইয়া ফিরিয়া আসিলে একটু বিশ্রামের পর পিতৃদেব ঠাণ্ডা হইবার জন্য মুখে চোখে ও কাণে বারবার ঠাণ্ডাজল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঐ সাহেবটী আমার পিতার সহিত বিশেষ সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি ওরূপ করিতেছ কেন? ওরূপ করিলে কি শরীরের ক্লান্তি দূর হয়?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন "মুখে ও কাণে জল দিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। আপনি করিয়াই দেখুন না।" ইহা শুনিয়া সাহেব অঞ্জলি পাতিয়া জল লইলেন; এবং মুখের কাছে সেই অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়াও গেলেন; কিন্তু তার পরই কি ভাবিয়া সেই জলাঞ্জলি ফেলিয়া দিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "না, আমি এরূপ করিতে পারি না; যেহেতু কোন ইয়োরোপিয়ান করেন না।" স্বদেশীয়ের অসাক্ষাতে এবং এক-জন বিদেশীর সাক্ষাতে অতি সামান্য বিষয়েও নিজ সমাজে অপ্রচলিত এই সামান্য পরানুকরণের দ্বারা নিজের শ্রান্ত শরীরকে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য হইতে এই যে তিনি স্বচ্ছন্দে বঞ্চিত করিলেন, এবং এতবড় সঙ্কীর্ণ মতটাকে প্রকাশ করিতে এতটুকুও দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন না, এর কারণ উহারা জেতার জাতি।

পরের ঠাকুর চাইতে এঁদের নিজের কুকুরটার উপরেও শ্রদ্ধা বেশী। আর সে শ্রদ্ধা প্রকাশকে এঁরা গৌরবের চক্ষে দেখেন; যেহেতু এঁদের মনে আত্মসম্মান বোধ জিনিষটা খুব স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত আছে। আর ঐ-টুকুর অভাব আছে বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়ে-পুরুষে নিজের ধর্ম্মকে, নিজের সমাজকে পদে-পদে বিদেশীর কাছেও লাঞ্ছনা-কষাহত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা হইতে অর্দ্ধ প্রবীণ পিতা পর্য্যন্ত সকলেই অর্ব্বাচীন, অজ্ঞ, কুসংস্কারান্ধ। এবং নব্য শিক্ষার মূল-মন্ত্রই এই যে পরানুকরণ করিতেই হইবে। যদি কোন ছেলে একটা ভাল পদ পাইলেন, দুই-চারি শত বাঁধা মাহিনা হইল (আর বিলাতে ফেরৎ হইলে তো আর কথাই নাই।) তৎক্ষণাৎ (অধিকাংশ স্থলে) একটা বাবুর্চ্চি, সাহেব-বাড়ীর-ফেরৎ তক্‌মা লাগান দু'চারিটা খানসামা, একখানা সাহেবি-কায়দায় সাজান বাংলাগোছের বাড়ী (কলিকাতা হইলে সাহেবদের সহিত ভাগ করিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলের সাহেব হোটেল বা ভাড়া-বাড়ীর একটা ফ্ল্যাট) এবং নিজের সাহেবী ও স্ত্রীর শুধু সাড়ীখানা বাদ আর সমস্তই হাল ফ্যাসানের মেমসাহেবের সঙ্গে সমান হিসাবে জুতা, মোজা, ব্লাউস্, পেটিকোটের, চায়না বাসনের গাদা দিয়া নবজীবনের মঙ্গলাচরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মেয়েরা যাঁরা তিন পাতা ইংরেজী পড়িয়াছেন, তাঁদের স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ—কোন কিছুরই ঋণ স্বীকার করিতে হয় না; তাঁহারা এবিষয়ে স্থানে স্থানে পুরুষদেরও পরাজিত করিতেছেন। তা মেয়েরা শিক্ষিতা এবং স্বাধীনা হইয়া কি দেশের ও দশের কোন কাজে লাগেন? উহুঃ। সযত্নে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, সে শিক্ষার সাধারণ্যে প্রচার চেষ্টায় দরিদ্রের পর্ণগৃহে এঁদের অভ্যুদয় ইঁহারা কি কখনও কল্পনা করিয়াও দেখিয়াছেন? স্বাস্থ্যতত্ত্ব সাগ্রহে শিখিয়া প্রতিবেশী দরিদ্রগণকে সে অমূল্য জ্ঞান দানে এঁদের কোনই আগ্রহ আছে? চিকিৎসা-বিদ্যা যথা শক্তি আয়ত্ত করিয়া (বিশেষতঃ হোমিও-প্যাথি ও বাইওকেমিক্ চিকিৎসা) রোগা-তুর দীন-হীন স্বদেশীকে আসন্ন মৃত্যু ও রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষার চেষ্টা ইঁহারা কি জীবনের পুণ্যতম ব্রত রূপে পালন করিতে চাহিতেছেন? লক্ষ-লক্ষ অজ্ঞ স্বদেশীর মুখের অন্নগ্রাস স্বরূপ বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে কি ইঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন;—স্বদেশীর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার-কল্পে স্বদেশীয় মহাপ্রাণ নেতার দ্বারা আহূত অনুরুদ্ধ হইয়াও এদেশের সহস্র সহস্র, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী নিজেদের দেহ-বিলাসের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটিতে দিয়া, দেশমাতৃকার

সেবাব্রত গ্রহণ করিতে কি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন? না,—কিছু না! কেন? যেহেতু, তাঁদের মধ্যের মনুষ্যত্ব আজ ধর্ম্মশিক্ষার অমৃত-নিষেক অভাবে অচেতন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের মধ্যে যে শক্তি মনুষ্যত্ব, তাহা সর্ব্ব-ভূতাধিষ্ঠিত চৈতন্য-শক্তির প্রকাশ। আধার যদি মলিন হয়, অভ্যন্তরের অতি উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিও বাহির হইবার পথ পায় না। আমাদের অন্তরের আলোকও আজ তাই আমাদের লোভাতুর চিত্তের ঘন বেষ্টনী মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া, আমাদের অমানুষে পরিণত করিতেছে। আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া শুদ্ধমাত্র বৈদেশিক বিলাসিতার সঙ্গে স্বদেশীয় আলস্যময় ভাবে জীবন যাপনকে সংযোগ করিয়া, এক অপূর্ব্ব-সৃষ্ট জীবে পরিণত হইতেছি। ধর্ম্ম আমরা মানি না; ধর্ম্ম আমাদের লোকহিতকর, বা আত্মহিতসাধক নয়, মাত্র আত্ম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-জ্ঞান। আমাদের না ব্রহ্মতত্ত্ব, না বস্তুতত্ত্ব,—শুধু বিলাসতত্ত্বটাই শিক্ষা হইতেছে ভাল করিয়া। যে দেশে অজীন-শয্যায় বল্কল-বসনে বনবাসিনী ঋষি-পত্নী ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, সে দেশের মেয়েদের আটপৌরে নিত্য সজ্জায় একটা ইজের, গেঞ্জি, একটা সেমিজ, দুইটা পেটিকোট, একটা বডিস্, একটা ব্লাউস্, একখানা (অধিকাংশ স্থলে) শান্তিপুরে, বড়জোড় ফরাসডাঙ্গার ১২ হাতি সাড়ী, একখানা রুমাল, একজোড়া চটিজুতা,—এতো চাইই। আর পোষাকীর হিসাব রাখিতে স্বয়ং একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেলও পারেন কিনা সন্দেহ। নব্য শিক্ষিত পিতামাতার ছেলে-মেয়ের (বেবি ও মিসিবাবার দল) আসনে-বসনে,শয়নে-ভ্রমণে ইংরাজ-বাচ্চার সহিত বর্ণ ব্যতীত আর কিছুতে খুব বেশী প্রভেদ নাই। ঘরের মধ্যে খৃশ্চান বা অর্দ্ধ-খৃশ্চান আয়ার সাহায্যে তাঁরা বাংলা বুলি শিখিবার পূর্ব্বেই ইংরাজি বুলি শিখিতে অভ্যস্ত। বাবা, মামা, দাদা, দিদি—সকলকারই আটপৌরে পোষাকের মত অষ্ট প্রহরের ভাষাও ইংরাজী। নেহাৎ যারা অতটা দূরে উঠিতে অক্ষম, তাঁদের একটা কথার মধ্যে অন্ততঃ আধখানার চাইতে একটুখানি বেশি-বেশি ইংরাজীর বুকনী দিয়া শোধন করা। যাঁদের আয় সহস্রার্দ্ধ বা তাও নয়, তাঁদের চাল দেখিয়া কে না সন্দেহ করিবে যে, পিছনে অন্ততঃ মহারাজ বর্দ্ধমানের সিকি আয়ের সম্পত্তি একটা আছে। গাড়ি-ঘোড়া এ যুগে যার নাই, সে তো ছোটলোকের সামিল। মোটর, এরোপ্লেন, সব্‌মেরিণ—এ তো ইচ্ছা করিলে তুমি-আমিও চড়িয়া বেড়াইতে পারি। আবার দুর্ভাগ্য-ক্রমে যাঁদের বাড়ীতে পশ্চিমে ঝড়ো হওয়া এখনও ততদূর জোর করিয়া উঠিতে

পারে নাই, তাদের মধ্যে অশান্তির জের নেহাৎ কম নয়। বুড়াবুড়ির দলকে (সম্ভবতঃ উত্তরাধিকারিত্বে অর্থ লাভের আশাতেই) স্পষ্ট লঙ্ঘন করিয়া নব্যেরা নিজেদের বিজয়-নিশান উড়াইতেও সঙ্কুচিত; অথচ মনের মধ্যে এই অধীনাবস্থাটা মরার বাড়া খোঁচ দিতে-দিতে জন্মটাকেই ব্যর্থ বোধ করাইতেছে। এই অবস্থার একটি মেয়ে, ভাসুর সম্পর্কীয়ের নিমন্ত্রণে কতকটা আধুনিক সুখ-সম্পদে পূর্ণ গৃহে আগমন করিয়া, মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—

"এমন একখানা বাড়ী যার নেই, এমন করে যে স্ত্রীকে রাখতে পারে না, তার গলায় মালা দেওয়ার চাইতে দড়ি দেওয়াই ভাল!"

অতঃপর হিন্দু নারীর কি এই আদর্শ দাঁড়াইবে? বিলাসিতা যদি দেশের এতবড় দুর্দ্দিনেও দেশের মেয়েদের জীবনের এতখানি সারাৎসার হইয়া দাঁড়ায়, যাহাতে দেশের মিলের মোটা সূতার মত সাড়ী পরিয়া মিলওয়ালাদের প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে না পারেন, নেতৃবৃন্দের প্রস্তাবমত বিলাসিতা যথাসাধ্য বর্জ্জন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইতে না পারেন, তবে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে, বিলাস-অলসিত জীবন যাপনই ভারত-নারীর পুণ্যময় ত্যাগ-মহত্ত্বে মহৎ চরিত্রেরই স্থানাধিকার করিতেছে না?

এ দেশে এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী নব্যনারী মহিমাকে অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিতেছেন। পতি-পুত্রের অন্যায়কেও যে এ দেশের নারী কতবড় প্রেমের বলে, ক্ষমার বলে সহনীয় করিয়া চলিতেছেন, আজও চলেন, ইহার মহিমা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না। ইহার মধ্যে শুধু দুর্ব্বলের অনুপায়ইত দেখিয়া থাকেন। তাঁদের জন্যও কি বলিব ইংরাজী বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্ব্বিবাহ প্রথা চালাইতে চান না, কি? আমার মনে হয় ঐ সকল স্থূল-দৃষ্টিসম্পন্ন নব্য লেখকেরা বিপত্নীক বা নিতান্ত গোবেচারা স্ত্রীর স্বামী। নতুবা ইবসেনের নোরা সাহিত্য-জগতে বা রঙ্গমঞ্চে মস্তবড় হিরোইন, বা বীর-চরিত্রা হইতে পারেন;—নিজের ঘরকন্নার মধ্যে ইঁহার আবির্ভাব, যতবড় সংস্কারকই হোন, কেহই পছন্দ করিবেন না। (ভারতবর্ষ)

(২) নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব

স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে, পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না —উভয়ের মধ্যে দুটী মুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল ; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পাইবে। আধিভৌতিক হিসাবেও—বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেনতেন প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে—সমাজের যে অর্দ্ধেকভাগ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে।

নারীর স্বাধীন উপজীবিকার মধ্যে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। আর আমাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কিছু কম করিতে পারে, সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল একটু সাজান গোছান একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাঁহারা বসিয়া বসিয়া গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজন মত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক অধিকার তখনই সত্যিকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনীতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তু-

টিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের যদি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের মধ্যে এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝির নারী-রাষ্ট্রনীতিক অধিকারের আন্দোলনটিই কেবল যে খাঁটি হইয়া উঠিতেছে তা নয়, নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যিকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বে-সর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে, মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায় আমাদের দেশে খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির। তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-শৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ ঐখানে পাওয়া যাইতে পারে। (উপাসনা)

ডালি

এসিয়ার নারী শক্তির জাগরণ

[শ্রীনীহাররঞ্জন দাশ বি, এ,]

সত্য বটে এশিয়া বহুদুর বিস্তৃত এক মহাদেশ এবং এই মহাদেশে বহু জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের বাস, কিন্তু ইহা দেখিবার বিষয়, কিরূপে সময়ে সময়ে সমগ্র দেশ একই ভাব প্রবাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। একই সময়ে কিরূপে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ধর্ম্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল; একই কালে কিরূপে সমষ্টির জীবনে একই সৌন্দর্য্য ও দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও এশিয়ার সমগ্র নারী জাতির অন্তরে একই সঙ্গে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে।

এ স্বাধীনতার তরঙ্গ পালেস্টাইন হইতে জাপান পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, এমন কি মুসলমান রমণীর প্রাণেও এই বাণী পৌছিয়াছে। কান্টনের রাজপথ মুখরিত করিয়া দক্ষিণ ভারতকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া এই স্বাধীনতার বাণী ছুটিয়াছে। প্রতি স্থানেই নারী জাতি শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চাহিতেছে; প্রতি ক্ষেত্রেই এই মুক্তির চেষ্টা অন্তরাত্মা হইতে আসিতেছে—পাশ্চাত্য বাসীর আগমনে বাহির হইতে যে এ চেষ্টা চলিতেছে এমত নহে। এশিয়ার নারীর প্রাণে সাড়া পড়িয়াছে, তাই তাহারা রুদ্ধ কারা ভাঙ্গিতে চায়। এ আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন দেশে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে কোথাও নারী আর পর্দ্দা-নশিন থাকিতে চায় না—কোথাও বা তাহারা ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে--কোথাও বা তাহারা পদবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় আর কোথাও বা তাহারা চায় শিক্ষার সুব্যবস্থা ও রাজনীতিক অধিকার, মুসলমান, ইহুদি, ভারতবাসী, ব্রহ্মবাসী, চীনা ও জাপানী লইয়াই এশিয়ার রমণী জাতি। মুসলমান রমণীর মধ্যে সাড়া পড়িয়াছে। পারস্যরমণীর পর্দ্দা ভাঙ্গিবার ইচ্ছা এত বলবতী যে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহারা প্রতিনিধি পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছিল। যুদ্ধের সময় আরমেনিয়ার রমণীগণ রাজ্য পরিচালন করিতে প্রস্তত হইয়াছিল; এমন কি জাপানে রমণী প্রতিনিধি নিযুক্তও করিয়াছিল। আর পালেসটাইনের ইহুদী রমণীগণ চায়

না সে আদালতে বিচারিত হইতে, যে আদালতের মতে স্বোপার্জ্জিত ও সন্তানের অভিভাবকত্বে স্ত্রীর অধিকার নাই, আর যে আদালতের বিচারে চিরটা জীবন পিতা, স্বামী ও ভ্রাতার অধীন থাকিয়া রমণীকে কাটাইতে হয়।

ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার অতি অল্প হইলেও ভারতীয় আইন্ কানুন্ স্ত্রী-স্বাধানতাকে কখনও খর্ব্ব করে নাই। স্ত্রী-জাতিকে তাহাদের ক্ষমতা-নুযায়ী পদ দিতে ভারত কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতের কোনও রাজ-নীতিক অনুষ্ঠানে নারীকে রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয় নাই। ভারতের ধর্ম্ম স্ত্রী-পুরুষকে সকল সময়েই একাসনে বসাইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে যে স্বরাজের আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতেও স্ত্রী-জাতির স্থান আছে। যাহারা কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন অধিনেত্রী শ্রীমতী বেসেণ্ট, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপা শ্রীমতী নাইডু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা, জননায়ক তিলক, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে উপবিষ্টা ছিলেন ও তুল্য সম্মানে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—এ দৃশ্য ভুলিবার নয়। স্থানীয় ব্যব-স্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার মাদ্রাজ রমণী পাইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয় ভারতীয় স্ত্রীকুলই একদিন সমগ্র এশিয়ার নারী জাতির পথ প্রদর্শক হইবে।

ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীজাতি বোধ হয় প্রাচ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন—দেশের ব্যবসা তাহাদেরই হাতে—অনেকেই শিক্ষিতা—বর্ণবিচার ও পর্দ্দা তাহাদের নাই।

চীন দেশের স্ত্রীজাতির প্রাণে যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। সাময়িক পত্রে আমরা দেখিয়াছি—৩০শে মার্চ্চ সহস্র সহস্র নারী সভা করিয়া ভোট দিবার অধিকার চাহিয়াছিল ও সভান্তে মিছিল করিয়া Canton এর রাজপথে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাহারা ভোট দিবার অধিকার পায় নাই

জাপানে স্ত্রীজাতি সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বুদ্ধ। তাহারা দেশের সকল কাজই করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০জন শিক্ষিতা। তাহারা আজও কোন রাজনীতিক অধিকার পায় নাই বটে, কিন্তু শিক্ষিতা রমণীগণ এক আন্দোলন তুলিয়াছে।

ইহা দেখিয়াই মনে হয় এশিয়ার নারী জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর

হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে এক অটুট বন্ধন বিরাজ করিতেছে, নচেৎ এই মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুক্তির কামনা এমন করিয়া একত্র জাগিয়া উঠিত কি? (Asian Review)

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত]

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

সঙ্গীত বলিতে গীত, বাদ্য, নৃত্য এই তিনই বুঝায়। যথা—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।"

সঙ্গীত—রত্নাকর।

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই তিনটীকে একত্রে তৌর্যত্রিক বলা হয়। ইহার মধ্যে গীত সর্ব্বপ্রধান। বাদ্য গীতের অনুগামী এবং নৃত্য বাদ্যের অনুগামী যথা—

"নৃত্যবাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যগীতানুবৃত্তি চ।
অতোগীতং প্রধানত্বাদত্রাদাবভিধীয়তে।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকাধৃত বচন।

সম্প্রতি আমরা গীত সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। গীত নাদাত্মক।

সঙ্গীত দর্পণে দামোদর মিশ্র লিখিয়াছেন—

"গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ং॥"

সেই নাদ আবার আহত এবং অনাহত ভেদে দ্বিবিধ। গুরুপদিষ্টমার্গে মুনিগণ অনাহত নাদের উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু উহা মুক্তিদ হইলেও রঞ্জক নহে। আহত নাদই রঞ্জক এবং ভবভঞ্জক। যথা—

"স নাদ স্ত্বাহতো লোকরঞ্জকো ভবভঞ্জকঃ।"

সঙ্গীত দর্পণ।

এই আহতাখ্য নাদোৎপত্তি এই ভাবে হয়—আত্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চিত্ত দেহস্থ 'বহ্নি" অর্থাৎ তেজ আহরণ করে, পরে ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত প্রাণবায়ু

কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই তেজ ক্রমে ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়ে ও গলদেশে সূক্ষ্ম, এবং শীর্ষে ও বদনে ক্রমে পুষ্ট ধ্বনিরূপে বহির্গত হয়। যথা—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নি মাহন্তি দেহজং।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ ॥ ৩৪ ॥
পাবকঃ প্রেরিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথেচরন্।
অতি সূক্ষ্মম্ ধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলেপুনঃ। ৩৫ ॥
পুষ্টং শীর্ষে ত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্তিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ততে বুধৈঃ ॥ ৩৬ ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

নাদ শব্দের 'ন'কারে প্রাণ ও "দ" কারে অনল বলিয়া জানিবে, কারণ প্রাণ নামক বায়ু এবং দেহস্থ তেজ সংযোগেই নাদের উৎপত্তি। যথা—

"নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
যতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে ॥ ৩৭ ॥

সঙ্গীত-দর্পণ

এই প্রাণ বায়ু নাভির নিম্নদেশে অবস্থান করে এবং নাসাপথে, মুখে, হৃদয়ে এবং নাভিতে বিচরণ করে। প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ এবং নিশ্বাসোচ্ছাস কাসাদির কারণ। যথা—

তেষাং (দশ বিধ বায়ু) মুখ্যতমঃ প্রাণো নাভি কন্দাদধঃস্থিতঃ।
চরত্যাস্যে নাসিকয়োর্ণাভৌ হৃদয়পঙ্কজে॥ ৪৪।
শব্দোচ্চারণ নিশ্বাসোচ্ছাস কাসাদি কারণম্ ॥ ৪৫ ॥

সঙ্গীত রত্নাকর।

যে ধ্বনি আপনা হইতেই শ্রোতার মন প্রফুল্ল করিয়া তোলে তাহাকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর বলে। যথা—

"স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বরউচ্যতে।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকা ধৃত বাক্য।

স্বয়ং যোরাজতে নাদঃস স্বরঃ পরিবকীর্ত্তিতঃ।

সঙ্গীত দর্পণ।

স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকাশ্চাসৌ স্বরইত্যভিধীয়তে ॥

সঙ্গীত দর্পণ।

শুদ্ধ স্বর সাতটি আর বিকৃত স্বর পাঁচটি অতএব মোট স্বর সংখ্যা দ্বাদশটি। যথা—

শুদ্ধাঃসপ্তস্বরাস্তেচ মন্দ্রাদি স্থানতস্ত্রিধা।
চ্যুতাচ্যুতাদিভেদেন বিকৃতা দ্বাদশোদ্দিতা॥ ৫৯॥

সঙ্গীত দর্পণ।

এই সপ্তস্বর আবার উৎপত্তির স্থান ভেদে তিন সপ্তকে বিভক্ত। হৃদয় হইতে যে সপ্তস্বর উত্থিত হয় তাহাকে মন্দ্রস্বর, গলদেশ হইতে উঠিলে মধ্যস্বর এবং মূর্দ্ধা হইতে উঠিলে সেগুলিকে তারস্বর বলে। মন্দ্র স্বর হইতে মধ্যস্বর দ্বিগুণ, এবং মধ্যস্বর হইতে তারস্বর দ্বিগুণ প্রবল। দেহ যন্ত্রে নিম্ন হইতে উর্দ্ধে স্বরের প্রবলতা হয়, কিন্তু কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রে ইহার বিপরীত উহাতে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে স্বরের প্রাবল্য হয় অর্থাৎ স্বর চড়িতে থাকে যথা—

ইতি বস্তুস্থিতিস্তাবদ্ গাত্রে ত্রিধাভবেদসৌ।
হৃদি মন্দ্রোগলেমধ্যো মূর্দ্ধ্নি তারইতি ক্রমাৎ॥ ৪৯॥
দ্বিগুণ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদয়ং স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
এবং শারীরবীণায়ং দারব্যান্ত বিপর্য্যয়ঃ॥ ৫০॥

বৈদিক অনুদাত্ত, স্বরিত ও উদাত্ত স্বরই যথাক্রমে সঙ্গীত শাস্ত্রে মন্দ্র, মধ্য, তার এবং আধুনিক উদারা, মুদারা, তারা হইয়াছে।

এই সপ্ত স্বরের নাম যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি। যথা—

"তেষাং সংজ্ঞা স-রি-গ-ম-প-ধ-নীত্যপরামতঃ।"

সঙ্গীত চন্দ্রিকাধৃত বচন।

(ক্রমশঃ)

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান। *

প্রথম গীত।

[রচনা———স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

নর্ত্তকীগণ।

মিশ্র ভূপালী———একতালা।

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু——আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই, তোমার কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি;
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে, আমরা দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি;
তুমি কভু দয়া করে,' বাজিও তোমার মোহন বাঁশী;
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হোয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী;
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু, আর, আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাহি বাস, নইক তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি॥

স্বরলপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

```
    ০            ১              ২              ৩
II { 1  1  সা । রা  গা  পা  I  র্সা  র্সর্সা  ধা । পা  -গা  -1 ।
     •  •  তু    মি  যে  হে     প্রা  ণের্     বঁ    ধু   •    ০
```

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "নারায়ণে"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।
——লেখিকা।

০ ১ ২´ ৩
। রা -গা রা । -া গা ররা I সা ধ্া রা । সা -া -া }।
আ ম্ রা । ॰ তো মায় ভা ল বা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। { া া সা । ররা গা গা I গা গা গা । গা -সরা -গা।
॰ ॰ তো মার্ প্রে মে মা তো য়া রা ॰॰ ॰

০ ১ ২ ৩
। গা -া গা । গগা গা রা I গা গা পা । রা -া -া } II
তা ই তো মার্ কা ছে ছু টে আ সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II { া া গা। গা পা ধা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া।
॰ ॰ তু মি শু ধু দি ও হা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ॰ ॰ ৩
। া া ননা। না ধা ধা I পা ক্ষা ধা । পা -া -া }।
॰ ॰ আম্ রা দি ব অ শ্রু রা শি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। { া া র্সা । র্সা র্সা ধা I না না না । ধা পা পা।
॰ ॰ তু মি শু ধু চে য়ে দে খ বঁ ধু

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা ররা I সা ধ্া রা । সা -া -া } II
আ ম্ রা ॰ কে মন্ ভা ল বা সি ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
II { া া সা । সা সা সা I ধ্া সা রা । রা া া ।
॰ ॰ আঁ খি মা লা শ ত দ লে ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া গা । মা গা রা I সা রা গা । গা -া -া ।
॰ ॰ দি ব ত ব প দ ত লে ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। া া পা । পা পা পা I ধা ধা পা । গা গগা গা ।
॰ ॰ তু মি স্নে হে ধ র গ লে আম্ রা

০ ১ ২´ ৩
। রা -গা রা । -া গা ররা I ধ্‌া সসা রা । গা -া -া } II
দে খ্‌ বো • তো মার্‌ ম ধুর্‌ হা সি • •

০ ১ ২´ ৩
II { া া পা । পা ধা নর্সা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া ।
• • তু মি ক ভু• দ য়া ক রে • •

০ ১ ২´ ৩
। া া ন না । র্সা না ধধা I পা ধধা র্রা । র্রা -া -া ।
• • বাজি ও তো মার্‌ মো হন্‌ বাঁ শী • •

০ ১ ২´ ৩
। া া র্সর্সা । র্সা র্সা ধধা I না ননা ননা । ধা পা পা ।
• • শুন্‌ তে তো মার্‌ বাঁ শীর্‌ ধ্ব নি বঁ ধু

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা রা I সা ধ্‌া রা । সা -া -া } II
আ ম্‌ রা • ব ড় ভা ল বা সি • •

০ ১ ২´ ৩
II { া া সা । রা গা মমা I মা পা পা । পা -া -া ।
• • তু মি মো দের্‌ হো য়ো প্র ভু • •

০ ১ ২´ ৩
। া া পপা । পা পা পপা I পা ধা ধা । ধা -া -া } ।
• • আম্‌ রা তো মার্‌ হ ব দা সী • •

০ ১ ২´ ৩
। া া ধা । ধা ধা ধা I র্সর্সা র্সসা ধা । পা -গা পপা ।
• • তু মি যে হে ব্র জের বঁ ধু • আর্‌

০ ১ ২´ ৩
। গা -পা গা । -া গা রা I র্সসা ধ্‌া রা । সা -া -া } II
আ ম্‌ রা • যে গো ব্র জ বা সী • •

০ ১ ২´ ৩
II { া া গা । গা পা ধা I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া -া ।
• • ভা ল বা স না হি বা স • •

```
   o    • •  ১              ২´              ৩
 । ১  ১  ন না। র্সা  না  ধধা I  পা  ধা  র্রা  ।  র্রা -া  -া } ।
   •  •  নই  ক  গো তায়্     অ  ভি  লা      ষী  •  •

   o         ১              ২´              ৩
 । ১  ১  র্সর্সা। র্সা  র্সা  ধা  I না  না  না  ।  পা  -া  -া  ।
   •  •  আম্   রা   শু   ধু   ভা  ল   বা     সি  •  •

   o         ১              ২´              ৩
 । ধা ধা ধা  । গা   -া   -া  I  রা  গা  রা  । ( সা  -া  -া ) } ।
   ভা ল বা    সি   •    •     ভা  ল   বা     সি   •   •

   ২´
 । র্সা -া -া  II  II
   সি  •  •
```

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] [ফাল্গুন, ১৩২৮।

স্বাধীনতার স্বরূপ।

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

স্বাধীনতার অর্থ কি? এক কথায় ইহার নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; তবে আমরা এইরূপে ইহার বর্ণনা করিতে পারি যে ইহা সেই অবস্থা ও সেই সর্ত্ত যাহা কোন জাতিকে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে এবং স্বীয় ভাগ্য গঠন করিতে সমর্থ করে। কিরূপে বিভিন্নজাতি জাতীয় স্বভাবধর্ম্ম ও জাতিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন ও নির্ম্মল রাখিবার জন্য স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছে, মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি পত্রে জলন্ত অক্ষরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা ফিন্‌ল্যাণ্ড পোল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও ভারতেও ইহার নিদর্শন পাই। ইহাদের প্রত্যেকেই বৈদেশিক শিক্ষাদীক্ষার বহিরারোপের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এই সকল জাতির ইতিহাস একই ধারায় বহিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা বৈদেশিক শিক্ষার নিকট স্বীয় সভ্যতার পরাজয় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে বৈদেশিক শক্তি হইতে কোনরূপ বাধা না পাইয়া আত্মভাগ্য বিধানের অধিকার পাইবার জন্য তাহারা স্বাতন্ত্র্য সত্তা স্বীকার করাইবার দাবি করিয়াছে।

আমাদের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাইনা ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষাদ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এইখানে আমি ভারতের কবি

রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমায় বাধা দিয়া বলিতেছে "পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার সম্মেলনেই জগতের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।"

আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে, যেমনটি এতাবৎকাল হইয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষা দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অসম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে। যখন ভারতে জাতীয় জীবনের অন্তর স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।

[আহ্‌মেদাবাদ জাতীয় মহাসমিতির নির্ব্বাচিত সভাপতির অভিভাষণের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ]

কবির প্রতি

(দরবেশ)

জাগো কবি! জাগো কবি।
স্বপন-রচিত নন্দন হতে
হের এ ধূলার ছবি।
দীর্ঘ তমস আঁধার অন্তে,
উষা হাসিয়াছে পূরব প্রান্তে,
পশ্চাতে তার কিরণ-কান্ত
ওই ধ্বান্তারি রবি।

মন্মথ-মেখলা ছড়ায়ে গিয়েছে
চির আঁধারের ভুমে ;
অন্ধকারের বন্দীরা আজি
জেগেছে আলোর চুমে।
কণক-বিজলী ছেয়েছে গগন,
ঘুমভাঙাদল মেলেছে নয়ন,
এ নব প্রভাতে রাঙাও ভুবন
নব সুর-কুঙ্কুমে।

বিশ্ব-ভারতী-শ্রীকর-দীপ্ত
নিয়ে এস তব বীণা ;
নিঃস্ব রিক্ত ভাইরা তোমার,
জননী তোমার ক্ষীণা।
পেটে নাই ভাত, মুখে নাই কথা,
বুক পোড়া শুধু নিরাশার ব্যথা,
চির লুন্ঠিতা বঞ্চিতা মাতা,
মহারাণী—আজি দীনা।

আনন্দ-পূত নন্দন হতে
আনো গান—আনো গান ;
দীপ্ত রঙীন রক্ত রাগিণী,
শক্তি-সফল প্রাণ।
ভিখারীর দল হয়েছে বাহির,
মুক্তির লাগি পাতিয়াছে শির,
হে চারণ! হের হাসিছে মিহির,
তোল তোল বীণাখান।

গাও সেই গান, যে গানে আবার
জাগিবে শৌর্য্য বল ;
গাও সেই গান শত ঝঙ্কায়
রবে যাহে অবিকল।

গাও সেই গান, মরমে মরমে
জাগিবে জীবন করমে করমে,
সত্য ন্যায়ের সহজ ধরমে
হইবে সমুজ্জ্বল।

গাও সেই গান, যে গানে ভারত
তিল সহিবেনা আর,
অত্যাচারের রক্ত মুরতি,
অন্যায় ব্যবহার।
যত পাপ এরা করেছে জীবনে,
ভায়ের ঘৃণায়, নারীর বেদনে,
ধুয়ে যাক্ সব বীণা-নিস্বনে
শুষে যাক্ সব ধার।

বিশ্ব-মায়ের অমৃত পুত্র,
ওগো কবি মহাজন!
নিঃস্ব-মায়ের গাঢ় নিশ্বাসে
কাঁদুক তোমার মন।
হে অমর বীণা! জাগাও পরাণ
বাজাও বাজনা, গাহ গাহ গান,
মরণ যাত্রি! হও আগুয়ান,
সমুখে সিংহাসন।

মনের লীলা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

'রাজাদা, আমরা বুঝি মজা দেখতে যাব না! বা-রে!"

"কিসের মজা ভাই?"

"এই যে গড়ের মাঠে কত বাজি হবে, রাস্তায় চারদিকে কত আলো

জলবে ! বাঃ, তুমি বুঝি আর জান না। এত লেখাপড়া শিখেছ, এই খবরটা বুঝি আর রাখ না। না, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ।"

"ওঃ, তাই বল্, আচ্ছা তুইই বল্ না, কিসের জন্য এ উৎসব হচ্ছে ?"

"বাঃ, তা বুঝি আমি জানি না, আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার মশায় যে বলে দিয়েছেন আমাদের রাজপুত্তুর কলকাতায় এসেছেন, তাই সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এত ধূমধাম করছে। বাতি জ্বালিয়ে সাহেবপাড়া নাকি ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। না, আমি দেখতে যাবই।"

"দেখ কমল, এ উৎসব কারা করছে জানিস্। এ উৎসব দেশের লোক কেউ করছে না, করছে জন কতক সাহেব সুবো যাদের এ দেশের উপর কোন টানই নেই, যারা এ দেশের দুর্দ্দশা দেখে হাসে, আর উৎসব করছে তারা যাদের সঙ্গে দেশের কোন সম্পর্কই নেই যারা সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজীর দল। ভেবে দেখ কমল, যখন দেশে শতকরা নব্বইজন দুবেলা দুগ্রাস অন্ন জোটাতে পারে না, তখন কি না দেশের এত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কিসের উৎসব বল দেখি ভাই, এযে আমাদের বুকের রক্ত নিয়ে তাণ্ডব-লীলা। এখন কি উৎসব করবার সময় ভাই ? দেশের যাঁরা প্রাণ হিন্দু মুসলমান, তাঁরা মায়ের কাজে কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন ; আর আমরা মজা করে বাজি দেখতে যাব, আর স্ফূর্ত্তি লুটব। ছিঃ ভাই।"

"না রাঙ্গাদা, আমি তোমার অত সব বড় বড় কথা বুঝি না, সকলে যাবে, আমি বুঝি যাব না। আমি যাবই, বা রে।"

"কমল, তুই যদি একান্তই যেতে চাস্ ত যা, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আমার বোঝাবার ভার বোঝালাম। জানিস্ ত আমি কারও স্বাধীন-ইচ্ছার উপর হাত দিই না। তবে আমি ত নিয়ে যেতে পারবনা। আর কেউ যদি তোকে নিয়ে যায় ত সঙ্গে যা।"

কমলরঞ্জন পুলকিত মনে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

"আজ আমাদের ছুটি ওভাই
আজ আমাদের ছুটি ;
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।"

*　*　*　*　*

উপরের কথাবার্ত্তা সুখরঞ্জন বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলরঞ্জনের মধ্যে হইতেছিল। সুখরঞ্জন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের অধ্যাপনা করিতেছিলেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশভক্তের মুখ দিয়া দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল। সুতরাং সুখরঞ্জন বাবু সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক মনে কংগ্রেসের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রকৃতি খুব নিরীহধরণের ছিল। সে কাহারও স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত না, সুতরাং যখন তাহায় কনিষ্ঠ সহোদয়েরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল, তখন সে তাহাতে কোনওরূপ আপত্তি করিল না। আজ ২৭শে ডিসেম্বার তারিখে সমপাঠিদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও রাজকুমারের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কমলরঞ্জনের কোমল মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার রাঙ্গাদাদার নিকট আসিয়া আলোক ও বাজি দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অনেক আবদার করার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া সে পাড়ার কোনও সমপাঠীর অভিভাবকের সঙ্গ ধরিতে চলিয়া গেল।

*　*　*　*　*

"রাঙ্গাদা, ও রাঙ্গাদা, বেশ মজা হয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র, অমনি দেখি ও বাড়ীর অনাথ, ওইযে অনাথ আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে,—ছিপছিপে ফরসা ছেলেটি যাকে তুমি একদিন খুব বুদ্ধিমানের মত চেহারা বলেছিলে ;—সে আমাকে ডাকতে এসেছে। তারা সব তাদের বাড়ীর গাড়ী করে ময়দানে মজা দেখতে যাচ্ছে, আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছে। যাব ? বেশ ত যাই না ? তাহলে আর কাউকে আমার খোঁজ করতে হবে না।"

"আচ্ছা, তোর ইচ্ছে হলে যা। আমিত বলেছি তোর ইচ্ছের উপর আমার আপত্তি নেই। তবে সাবধানে যাস্। ঠাণ্ডা বেশী যেন লাগে না, দিন কাল ভাল না। বুঝলি।"

"আচ্ছা, তা আমায় বলতে হবে না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। যাই তা হলে, বুঝলে।"

• • • • •

কমল রঞ্জন চলিয়া গেল। সুখরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে আজ তিন চার বছরের আগেকার কথা। সুখরঞ্জনের পিতা মৃতশয্যায় ছোট পুত্র দুটিকে সুখরঞ্জনের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোকে মানুষ করেছি, এখন ভাইদের তুই মানুষ করে তুলবি।" সে কথা সুখরঞ্জন ভুলে নাই, নিজের সাধ্যমত ভাইদের শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য সে চেষ্টা করিয়াছে। অর্থে যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, স্নেহ দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ ও তার মন্দ জুটে নাই। কিন্তু যখন অত্যাচার ও অবিচারে দেশবাসীর মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আত্মোন্নতির জন্য সকল প্রকার বৈধ উপায়কে শাসকসম্প্রদায় নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইয়া—দেশবাসীর মনে সদাপ্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অসন্তোষ বহ্নিকে পীড়ন ফুৎকারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল, তখন অনেক ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও সুখরঞ্জন স্থির থাকিতে পারিল না। কত কথা তার মনে পড়িল। তার ভাইদের শিক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, জীবনে ভোগ সুখের কথা, কত বিনিদ্র রজনী সে কাটাইল। একবার ভাবে,—আর না, সময় বহিয়া যায়, তাহার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে মনে সে—একপদ অগ্রসর হয় আবার এস্তপদে সে ফিরিয়া আসে। এক পা, আর এক পা, অমনি মনে পড়ে ভাইদের খাওয়াইবে কেমন করিয়া। জীবন তাহার অসহ্য বোধ হইল। দিবানিশি ভগবান্‌কে ডাকিয়াও সে ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না। এমন সময় চাঁদপুরের নিরন্ন, কঙ্কালসার কুলিদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সপাৎ করিয়া কে যেন সুখরঞ্জনকে এক প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিল। না আর ত নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকা চলে না। যা করেন ভগবান্‌ বলিয়া সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে নামিয়া পড়িল। সত্যই ত কে কাহার আহার দেওয়ার মালিক। মানুষ ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া অহংকে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই মানুষ জীবনে অশান্তিকে ডাকিয়া আনে। তাহাই হউক ভগবান্, তুমি যাহা স্থির করিবে তাহাই হউক এই ভাবিয়া সুখরঞ্জন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। কিছুদিন অভাবে অনটনে অথচ মনের শান্তিতে তাহাদের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু আজ যখন কমলরঞ্জন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অর্থের অভাবে পাড়ার বড়-লোকের সঙ্গে উৎসব দেখিতে বাধ্য হইল, তখন সেই বুকের এক পাশে স্তূপাকার

দুঃখরাশি হঠাৎ বড় ভারি বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, কত বাসনা আকাঙ্ক্ষার রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া জীবনটাকে রামধনুর মত বিচিত্র করিয়া তুলিবার কল্পনা তাহার ছিল। কিন্তু কি করিবে, দেশের আহ্বানে তাহাকে সাড়া দিতে ত হইবেই। নহিলে যে সে দেশদ্রোহী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সুখরঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

*   *   *   *   *

হঠাৎ সুখরঞ্জনের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া কমলরঞ্জন বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুখরঞ্জন বলিয়া উঠিল—"কিরে কমল, গেলিনে যে?" কমলরঞ্জন উত্তর দিল—"না রাঙ্গাদা যাওয়া হল না।"

"কেন রে, কি হল তোর? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

"না, রাঙ্গাদা, কেউ ত কিছু বলে নি।"

"তবে?"

"তবে কেন যে আমার যেতে ইচ্ছে হল না, তা আমি নিজেই বল্তে পারি না।"

"কি ব্যাপার, শুনিই না।"

"শোন রাঙ্গাদা, জীবনে আমার এমন কোন দিন হয় নি। আমি কাপড় চোপড় পরে অনাথদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে গেলুম এমন সময়ে আমার বুকের মধ্যটা কেমন করে উঠ্ল। এমন আমার কখনো হয় নি। কে যেন মনের ভিতর থেকে মুখ খানা ম্লান করে বলে উঠল —ছিঃ কমল, কোথায় যাস, বুঝতে পারছিস্ না কারা উৎসব করছে। পেছিয়ে গেলুম, অনাথ এসে হাত ধরে বল্লে উঠ না ভাই কমল। আবার উঠতে চেষ্টা করলুম, আবার মনের মধ্যে ঐ কথা বেজে উঠ্ল। আমি ফিরলাম, অনেক সাধ্য সাধনাতেও আর গাড়ীতে উঠতে গেলাম না। মনে হচ্ছে একখানা করুণ মুখ আমার ভিতর গুমরে গুমরে কাঁদছে, সে মুখখানা যেন আমাদের ভারতমাতার। রাঙ্গাদা, তোমার ইচ্ছাই শেষকালে আমাকেও বশ করলে।"

"ভাই কমল, আমার ইচ্ছা তোমায় বশ করেনি। এ ভগবানের ইচ্ছা। জেনো, সব সময়েই মনে রেখো মানুষের নিজের মনের উপর ও নিজের হাত নেই। তুমি যে আজ অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে ফিরে এলে, এ সেই লীলাময়ের ইচ্ছায়ই হয়েছে, তোমার আমার এতে হাত নেই। ভগবানের হাতে ক্রীড়া-

পুতুল আমরা তাঁরই ইঙ্গিতে আমরা স্বরাজের পথে চলেছি। তাঁরই ইচ্ছায় তোমার মত সকলের মনেই আজ এমনি লীলা চলছে। আশীর্ব্বাদ করি এই রকম সব সময়ে বিবেকের বাণীর অনুসরণ করো, সেই হচ্ছে মানুষের চিরন্তন মনের লীলা!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল—

সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।
কিসের লাগিয়া দীপ জ্বালিস্‌রে,
কিসের লাগিয়া সুখে হাসিস্‌ রে,
উৎসবে তুই কেন মাতিস্‌ রে
জননী বহে যে শৃঙ্খল ভার;
মুখ ঢাক ভাই মুখ লুকাও রে
দীপ নিভে যাক্‌ দীপ নিভাওরে
অন্তরে তোর স্থির জাগাওরে
বিষাদখিন্না মুখখানি মার।
সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ভাষাবিজ্ঞান—ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ—

ইংরেজী Philology শব্দের অর্থ—ভাষা এবং সাহিত্য—ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—

ভাষা ভাব বিনিময়ে উপায়। শুধু শব্দের দ্বারাই যে ভাব বিনিময় করা যায় তাহা নয়। নানারূপ চিহ্ন সঙ্কেতাদির দ্বারাও ভাব বিনিময় ঘটিয়া থাকে।

আর এই ভাব বিনিময় মানুষের মধ্যে যে কেবল প্রচলিত এমন নয়, পশুপক্ষীর ভিতরও ইহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কুকুর, ঘোড়া, হাতী, বানর প্রভৃতি বুদ্ধিমান জীবের সহিত মানুষের ভাবের আদান প্রদান চলিয়াছে। তবে যে অবস্থায় আসিলে ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করা চলে, একমাত্র মানুষেই সেইরূপ ভাষা বলে।

ভাষার উৎপত্তি, পরিণতি, বিভিন্ন আকার ধারণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং সাধারণ তথ্য নির্দ্ধারণ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভাষা এবং ভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ কি পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে লিখিত বিবরণ হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

এই প্রসঙ্গে ভাষা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাষার চলিত নামগুলির আলোচন সুবিধাজনক হইতে পারে। ইংরেজীতে Science of Language নামটি সুপ্রযোজ্য জার্ম্মাণ ভাষায় এই নাম sprachwissenschaft (sprach — speech — বাক্ wissens chaft — knowledge — বিদ্যা)—ফরাসী নাম Linguistique ইংরেজীতে আরও একটি নাম দেওয়া হয় glottology = the science of Tongues = এইরূপ কত নামই চলিত আছে। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় ভাষা বিজ্ঞান নামটি এই অর্থে ব্যবহার করিব।

ইংরেজীতে যাহাকে comparative Philology অর্থাৎ তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান বলে, তাহাতে ভাষার সমস্ত উপাদান এবং বিভিন্ন বিকাশক্রিয়ার আলোচনা থাকা উচিত। Comparative Grammar অথবা তুলনামূলক ব্যাকরণ ইহা হইতে পৃথক শাস্ত্র। ইহাতে ভাষার গঠন সম্বন্ধীয় নীতি এবং পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা আরও সীমাবদ্ধ ভাবে থাকে (a more limited comparis on of structural principles and methods)। Historical Grammar বা ঐতিহাসিক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বিভিন্ন কালে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থাবিশেষের বর্ণনা এবং ক্রমপরিণতির বিষয় সংগ্রহ করে। Descriptive Grammar বা বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ কোনও একটি ভাষার বর্ত্তমান অবস্থার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় আকার প্রকারের বিষয় বর্ণনা করে।

ইংরেজীতে যাহাকে সাধারণত এখন Philology বলা হয়, তাহার আদি অর্থে বুঝাইত—কোনও একটি জাতির চিন্তা পদ্ধতি সভ্যতার বিকাশ ধারা এবং আর্টের পরিচায়ক রচনা বিষয়ে পাণ্ডিত্য পূর্ণ—সাহিত্যিক এবং ভাষা বিষয়ক আলোচনা। (literary and linguistic study and learning concer-

ned with the writings of a people as representive of its thought, style, cultura aud art)। ফরাসী এবং ইউরোপীয় অন্যান্য ছু একটি ভাষায় এখনও Philology কথাটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এস্থলে অতি সহজ হইলেও একটা কথা সাধারণ পাঠকের নিকট উল্লেখ করিতে চাই। ভাষা এবং সাহিত্য যে এক জিনিস নয়—অনেকে একথা সব সময়ে মনে রাখেন না। ভাষার ইতিহাস এক জিনিস—সাহিত্যের ইতিহাস আর এক জিনিস। আমরা এখানে শুধু ভাষার ইতিহাসের কাথাই আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকভাবে এই ইতিহাস আলোচনা করিবার নামই ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ—আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের প্রথমেই করিয়া লইতে হইবে। প্রথমে কোনও বিশিষ্ট ভাবে লক্ষ্য না করিয়া শুধু "ভাষা" এই শব্দটিতে যাহা বুঝায় সাধারণভাবে তাহারই—আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সকল ভাষার অন্তর্নিহিত যে মুল সূত্র গুলি আছে সেগুলি বুঝিতে হইবে।

(১) ভাষার ইতিহাস (History of Language)

(২) অর্থের ইতিহাস (History of Meanings or Semantics)

(৩) ধ্বনির ইতিহাস (History of sounds or phonetics)

(৪) অক্ষরের ইতিহাস (History of writing or Palaeography)

(৫) বিভক্তি-ধাতু-প্রত্যয়াদির ইতিহাস (History of Parts of speech, prefixes suffixes etc. or morphology)

(৬) বাক্‌বিন্যাস রীতির ইতিহাস(History of Sentence structure or syntax)

(৭) প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস (urgeschichte Germant Ur—original, Geschichte—History of Primitive Culture as revealed through words.

এই বিভাগকয়টির ভিতর একটি সম্বন্ধের ধারা আছে। আত্মার বিশিষ্ট শক্তি স্ফুরণের জন্য ভাষার সৃষ্টি হইল। ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অর্থ আরোপিত হইল। সেই অর্থের প্রকাশক দেহ স্বরূপ শব্দের বা ধ্বনির সৃষ্টি হইল। সেই ধ্বনিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য লিপির আবশ্যক হইল। কালক্রমে বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন ধ্বনি সমষ্টির আকারগত প্রভেদ এবং পরিণতি

ঘটিল। অনেকগুলি শব্দের সমষ্টি লইয়া বাক্যের বিন্যাসপদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধানতম বিষয় হইল। শব্দের আকার অথবা অর্থের সাহায্যে মানবের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে—তাই এই আলোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম অঙ্গস্বরূপে বিবেচিত হইল।

নির্ভরতা

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

মানুষ যে ভগবানকে পেতে চায় তাও তার নিজের মতন করে। ভগবান যখন বৃন্দাবনের প্রেমময় মূর্ত্তিতে আসেন মানুষের এমনি সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডি যে সে তখন নিজের যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রেমময়ের মাধুর্য্যকে হারিয়ে ফেলে। ভগবান তখন মাতৃরূপে বুকের কাছে টেনে নেন তখন তাঁর উপর নির্ভর না করে নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেখানে মোহকেই দেখে থাকে। স্ত্রীরূপে যখন প্রেমালিঙ্গন করেন তখন কামকেই প্রেমের আসনে স্থান দেয়, বন্ধুরূপে যখন অবতীর্ণ হন তখন স্বার্থকেই বড় করে তোলে। মা অন্নপূর্ণা যখন খাওয়ান দাওয়ান তখন যেন দিন দিন আস্তে আস্তে কেমন একটা সামর্থ্যহীন হয়ে পড়ে। এই প্রেমের মধ্যে, মাধুর্য্যের মধ্যে কোমলতার মধ্যে যে একটা ভগবদ্‌শক্তির বিকাশ তা মানুষ দেখ্‌তে পায় না—মনে করে শক্তিহীন হয়ে যাবে। আবার যখন ভগবান্ ভীষণ সংহারিণী মূর্ত্তি ধরে রুদ্রভাবে অবতীর্ণ হন তখন যেন বুক দুর দুর করে কেঁপে উঠে সেখানে যে প্রেমের বিন্দুমাত্র আভাস আছে তাও মানুষ মনে কর্‌তে পারে না। যখন শত্রুরূপে এসে দেখা দেন তখন হিংসা দ্বেষ মান অভিমান এসে হৃদয় অধিকার করে বসে। তাই মানুষ কোন অবস্থায়ই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যখন ভিতরে কোমলতার বন্যা দিয়ে ভাসিয়ে দেন, সরলতার সাগরে ডুবিয়ে দেন তখন মনে হয় বুঝিবা মানুষ হৃদয়ের কোমলতা ও সরলতার উপর টেক্স বসিয়েছে। সর্ব্বভাবে ভগবান যে পরিপূর্ণ রূপে আমাদের নিকট এসে হাজির হচ্ছেন তা না দেখে আমরা কোমল হতে কঠোর আবার কঠোর হতে কোমল করে তোলপাড় করে থাকি—ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। পরিপূর্ণ সত্তাকে খণ্ড করে দেখ্‌তে চাইলে ভগবান তাতে রাজী নন, তিনি যে চান মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুল্‌তে।

এই যে অবস্থা তার মুল কারণ আমাদের অহমিকা ও ভগবদ্‌নির্ভরতার অভাব। আমরা মনে করি আমাদের মঙ্গল আমরা যেমন বুঝি আর কেউ তেমন নয়। বিশ্বাস কর্‌তে পারি নে যে ভগবান্ যখন সংসারে এনেছেন তখন তাঁর যা উদ্দেশ্য তা তিনি অবশ্যই আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন এবং তাতেই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র আর তাঁর শক্তি কত বেশী মুখে বল্‌লেও বুঝি না।

তাই যতদিন পর্য্যন্ত আমি কোন বিশেষভাবে সাধনা করে তগবানকে লাভ করব এ অহমিকা মনে থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁকে লাভ করা যাবে না। ভগবান্ সমস্ত গীতায় বিশেষভাবে সাধনার কথা বলে উপসংহারে এই কথাই বলছেন, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

জীবনে অনেকদিন দেখেছি শত চেষ্টা করেও নিজের দুর্ব্বলতাকে দূর কর্‌তে পারি নাই, মনে মনে ভগবানের নির্দ্দয়তার কথাও ভেবেছি, কিন্তু তারপর এখন এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও ভগবান্ আছে, এর মধ্যেও প্রেমময়ের মধুর ভাব বিশেষভাবে বর্ত্তমান রয়েছে ভাব্‌তে পেরেছি তখনই দুর্ব্বলতা দূরে গিয়েছে। ভগবান্ এমনি করে দিন দিন কত শিক্ষা দিয়ে কত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে সত্যে নিয়ে যাচ্ছেন। খেলা কর্‌তে কর্‌তে বাপ ছেলেকে মাথার উপর তুলে ধরে ছেলে ভয়ে ভীত হয়, তারপর মুহূর্ত্তেই আবার বুকের কাছে টেনে নেয়ার আনন্দটা আরো আনন্দময় হয়ে উঠে। সংসারে লীলাময়ের লীলা বৈচিত্র্যকে যদি এমনি করে দেখ্‌তে পারা যায় তখন কবির কথাই ঠিক্‌বলে প্রতীয়মান হবে,—

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছ গোপন।"

সে প্রেম সে নির্ভরতা জমাট বাঁধলে পরে ভীষণ বিষধর সর্পে দংশন কর্‌লেও বল্‌তে পারে "প্রিয়তমের বার্ত্তাবহ" তাঁরই বারতা জানাইতে এসেছে। পাহাড়ী বাবার জীবনী এইরূপ নির্ভরতার জলন্ত দৃষ্টান্ত। চোর যখন সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌তে এল তখনও মনে বৈরীভাব আসে নাই, প্রেমময়কে ধরবার জন্য যেমন করে ছোটে তেমনি করে ছুটাছুটি করেছিল। সমস্ত গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমি তো একখানা নির্ভরতার ইতিহাসই দেখ্‌তে পাই, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি খাটিয়ে অর্জ্জুন যখন ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতা হয়েছিল তখনই বলেছিল,—

"যৎ শ্রেয়ো স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাংত্বাং প্রপন্নম্।"

যাহা শ্রেয় তাহা নিশ্চিত করিয়া আমাকে বলো। বলিতে গেলে ইহাই গীতা শাস্ত্রের আরম্ভ। তখন পর্য্যন্তও অর্জ্জুনের বিচারবুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই, ভগবৎসত্তার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিতে পারেন নাই, তখনও সন্দেহ আছে, কেবল মাত্র নির্ভরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। তারপরে আরো নানাপ্রকারে সর্ব্ববিষয়ে বিশদ আলোচনা গীতার ভাষায় যাকে বল্‌তে পারি "বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষণঃ" গত সন্দেহ হইল তখনই বলিল "করিষ্যে বচনংতব।" ইহাই হইল গীতার শেষ কথা। তাই আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের ভগবান্‌কে যে চাওয়া তাঁকে যে পাওয়া তা তখনই ঠিক্ হবে যখন আমরা সকল প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়ে অর্জ্জুনের মত বল্‌তে পার্‌ব "করিষ্যে বচনং তব।"

মাতা পুত্র

[শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়]

মা। কেন বৎস হেরি তোর বিরস বদন?
কোন্ বিষাদের ছায়া দিয়াছে আঁকিয়া
করুণ ম্লানিমা তোর বদন-সরোজে?
বল মোরে কোন্ ব্যথা বাজে তোর বুকে।

পু। দুর্ভিক্ষের হাহারব উঠিতেছে আজি
দেশের মরম ভেদি', তাই বড় ব্যথা
বাজে বুকে, ভাবি হায় দারুণ বিধাতা
কত দুঃখ লিখেছিল এ দেশের ভালে!
মৃত্যু—মৃত্যু চারিদিকে,—ঘোর অন্ধকার!
মৃত্যুরূপা মাতা যেন পেতেছেন কোল
সকল দেশের তরে, তাই হেথা লোকে
বাঁচিয়া মরিয়া থাকে, মরে' তবে বাঁচে!

মা। তিমির-দেশেতে মোরা পথহারা-জন,
সত্য বটে ; কিন্তু এই মরণ-আঁধারে
দহিয়া সোনার রঙ্গে, নব জীবনের
দীপ্ত অগ্নিশিখা কিগো উঠিবে না জ্বলে ?
সকলের শেষ আছে—মোদের এ দুখ
অশেষ অনন্ত হ'য়ে রবে চিরদিন ?
এই দুঃখ-ব্যধি হ'তে দিতে অব্যাহতি
আছে কোন প্রতীকার—দেখেছ ভাবিয়া ?

পুঃ। অনেক ভেবেছি মাগো, কিন্তু দিশাহারা
মনতরী কূলহীন এ চিন্তা সাগরে !

মা। বিরাট এ ভারতের বিপুল জীবনে
কত রোগ, কত শোক, কত দুঃখ রাশি
বিচিত্র আকারে নিত্য আসি দেখা দেয় ;
কে এমন মন্ত্রদ্রষ্টা আছে ঋষিবর
বুঝিয়া কারণ তা'র করে প্রতীকার ?
আশা-নিরাশার আর আলো-আঁধারের
মায়া-যবনিকা আজি ঢাকিয়াছে দিশি,
অন্তরের দিব্যালোকে তমো-আবরণ
নিমেষে ভেদিয়া তা'র দেখাইবে পথ
যেইজন, তা'রি পথ চেয়ে বসে আছে
নিখিল ভারত, আজি সকল কর্ম্মের
মাঝে, মর্ম্মে নিতি নিতি ধ্বনিছে ক্রন্দন
তা'রি লাগি, শত চেষ্টা, শত অস্থিরতা
যাচিছে তাহার মাঝে লভিতে বিরাম।

পুঃ। হেন জন আসিবেন আমাদের মাঝে ?
কতদিনে মিলিবে মা তাঁহার সাক্ষাৎ
আঁধার ভবিষ্যাকাশে আগমন যাঁর
নব জীবনের উষা করিবে ঘোষণা ?
কিবা তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কিবা তার বাণী ?
কিবা তাঁর ধর্ম্ম মাগো ? পথহারা জনে

কোন্ পথে ল'য়ে যাবে আলোকের দেশে ?
জান যদি, কহ মাগো, হৃদয় ব্যাকুল !
মা। কেমনে বলিব বাছা, জননী কি তোর
শক্তিরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্ঞানের আধার ?
তোর কাছে মা যে তোর বিশ্ব-বিকাশিনী
বিশ্বের নিকটে সে যে দীন ধূলি কণা !
তা'র মুখে সাজে কিরে এই মহাবাণী ?
দেশভাগ্য-বিধাতার ভবিষ্যৎ কথা
শুনিলে তাহার মুখে, বাতুল বলিয়া
উপহাসি' যাবে সবে, তবে এই জানি,
মাতাপুত্রে বাতুলতা করিয়া রেখেছে
এ ধরণী মোহনীয়া সহজ সরল।
তবে আজ আয় বাছা, মাতাপুত্রে মিলি
অর্থহীন বাতুলতা প্রকাশি ধরায় ;
পাগলে বুঝুক শুধু পাগলের কথা।
কেবা সে, একক, কিংবা বহুজন হ'য়ে
আসিবে মোদের মাঝে জানিনা কিছুই।
শুধু এই মনে হয়—মহাভারতের
অন্তর্গূঢ় দীর্ঘতম সংহত সাধনা
বাহিরের মূর্ত্তি ল'য়ে হইবে প্রকাশ,
এক কিংবা বহু হয়ে আত্ম প্রয়োজনে ;
কাল পূর্ণ হ'বে যবে আসিবে সে জন।
শতদল কাটায়েছে তিমির রজনী,
নবীন উষার তরে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ;
সে নব জীবন রবি যেদিন হাসিবে
সে দিন হাসিবে সেও শত দল মেলি'।
ধর্ম্ম তা'র, বাণী তা'র সহজ উদার
নিত্য স্বচ্ছ আলো আর বাতাসের মত।
'শান্তি' 'সামঞ্জস্য' বহি' বরাভয় করে,
প্রশান্ত অভয় মূর্ত্তি, দেখা দিবতা'রে।

সকল প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন দ্রাবিড়গণের নিজস্ব; তাঁহারা স্বীকার করুন আর নাই করুন।

ইউরোপ ও এসিয়ার শকপ্রধান বহুদেশে এই পদ্ধতির অস্তিত্ব হইতে ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে দ্রাবিড়গণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে যে শক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যাঁহাদের ভাষা তাঁহাদের ভাষা হইয়াছে, সেই শকজাতির সাধারণ সম্পত্তি এই শবদাহ-পদ্ধতি তাহার ভস্মাবশেষ সংরক্ষণ প্রণালী এবং সেই সঙ্গে এই প্রকার মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের শিল্প। এই সকল সভ্যতার উপকরণ এবং তাঁহাদের ভাষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া দ্রাবিড়গণ অন্যান্য শকজাতিকে ছাড়িয়া ভারতে আসিয়াছেন। তৎপরে হিন্দুদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক হিন্দু হইয়া আপনাদিগের প্রাচীন সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুখের ঘর গড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

সপ্তদশ অধ্যায়

এই যজ্ঞভঙ্গের ফলে ভোলানাথের সহিত তাহার ভ্রাতৃজায়ার যে মনোমালিন্যের সূচনা হয় যাহা তখন সেরূপ মাত্রাধিক্যে পরিণত না হইলেও পরে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করে। যজ্ঞেশ্বরী নিজের চরিত্রগুণে সব দিক সামলাইয়া চলিতেছিলেন; কিন্তু যে পরিমাণ পুরুষত্ব ও চিত্তবল থাকিলে কাঁটা খোঁচাকে অগ্রাহ্য করা যায় ভোলানাথের তাহা ছিল না; পথে ঘাটে সে বিদ্রূপের বাণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উঠিল; শত্রুদলের বাড়ী কোন কাজকর্ম্ম হইলে তাহার নিমন্ত্রণ হইত না; স্কুলের চাকরীও রাখা সঙ্কটাপন্ন হইত যদি না মহেশ ভবানীর স্কুলের উপর জাগ্রত দৃষ্টিকে ভয় করিত। তবে পূর্ব্বের মত সুখে চাকরী করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশের ভয়ে যজ্ঞেশ্বরীকে প্রকাশ্যে সে কিছু বলিতে পারিত না, অথচ বাড়ীতে সে বিরক্ত হইয়া থাকিত। একান্নে থাকাতেই তাহার এই শাস্তি ঘটিল, ঘটিতেছে ও আরো ঘটিবে সে প্রত্যক্ষে না পারুক পরোক্ষে ভাবে ইঙ্গিতে কথায় ও কাজে যেখানে সেখানে জানাইতে ছাড়িত না; যজ্ঞেশ্বরী কখনো চাপিয়া ধরিলে সে মিথ্যার আড়ালে

আত্মগোপন করিত। অবশেষে একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে পলাইয়া যাইবার কল্পনাও করিতে হয়। ভোলানাথ লুকাইয়া তেজারতী করিত; দায় দৈবে পাড়ার লোক ভোলানাথের কাছে দু দশ টাকা কর্জ্জ করিত। তারামণির পিশি ব্রহ্ম ঠাকুরুণের অসুখ হওয়াতে চিকিৎসার জন্যে তারা—ভোলানাথের কাছ হইতে পাঁচটি টাকা কর্জ্জ করে। তারামণি কন্যা সন্ধ্যার একযোড়া মল বন্ধক রাখে। শুধিতে পারিব না বুঝিয়া তারামণি ভোলানাথকে উহা বেচিয়া ফেলিতে বলে। ভোলা এই উপলক্ষে তারামণির সহিত প্রায়ই দেখা করিত; একদিন সন্ধ্যার পর তাগাদা করিয়া ফিরিবার পথে ভোলানাথ বিক্রীত মালের দাম ১৭টাকা হইতে নিজ সুদ আসল প্রাপ্য মিটাইয়া লইয়া বাকী ফেরৎ দেয়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা; ঐ সময়ে জীবন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী ব্রহ্মঠাকুরাণীকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে ভোলানাথকে ঘর হইতে দেখিতে পায়; ভোলানাথ তাহাকে দেখে নাই, ভোলানাথ তারাকে ডাকিতে ইতঃস্তত করিয়া চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী তাহাকে শুনাইয়া প্রতিবেশীনী ঈশানভগ্নীকে ডাকিয়া কহিল "আহা ভোলা ছোঁড়া যেন কি হয়ে গেছে ভাজ্‌টাকে এনে পুষ্‌ছে গা আর মাগী উল্টে ছোঁড়ার হাল করে ছেড়ে দিলে; সে দিন ঘাটে বলছে··· ওর মুখ দেখানো ভার হবে বলে আমি তো কোট্ ছাড়তে পারিনি যা ভালো বুঝবো তা কর্‌বো দেওরের খাইনি যে তাকে ভয় কর্‌বো সে আমার নিন্দে করে দুর্নাম করে করুক, কেয়ার বড় গাঁয়ের জমিদারকে করি তা ত দেওর!" —ঈশানভগ্নী কাদম্বিনী বলিল—"ওমা তাই নাকি গো? তা বল্‌বেই তো মাগী যেন দেমাকে ফেটে রয়েছে—তা নইলে বোন্ অতগুনো ব্যাটছেলের সুমুখে বল্লে কি করে কথাটা;—"

কা। তবু পয়সা হাতে নেই থাকলে বোধ হয় সব·চাব্‌কেই না দিতো;—ছি কর মা ছি কর! বড়মান্‌সি দেখে গা জলে যায় মা—

তারার অসহ্য হইল, অথচ ভয়ে সে কোনো কথা বলিতে পারিল না; একটা ছল করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে ভোলানাথ—ভোলানাথ তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিয়া আড়ালে লইয়া গেল। হঠাৎ কাদম্বিনীর চোখ পড়িল সে বাহিরে আসিয়া দেখিল তারা ও ভোলা ধানগোলার পেছনে গেল। কাদু ঘরে ঢুকিয়া জীবনের পরিবারকে ডাকিয়া কাণে কাণে বলিল;—ভট্টাচার্য্য-আহ্লাদে আটখানা হইয়া যেন কিছু জানে না এই ভাব দেখাইয়া সেইখানে গিয়া

উপস্থিত হইল। তারা তাড়াতাড়ি টাকা কটা কাপড়ে লুকাইল। দুজনে ভারি অপ্রস্তুত হইল। ভোলা চলিয়া গেল। খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে, সে কথা হাজার বার সত্য। জীবন-পত্নী গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিলা তারু? কি হচ্ছিল?" তারা ভয় পাইয়া বলিল "কটা টাকা ধার চেয়েছিনু তাই এনেছিল।" "ওমা টাকা! তা ধার কেনা করে গো? তা অত লুকিয়ে চুরিয়ে যে?" তারা বলিল "পিসি পছন্দ করে না, ধার করি।" "তবু ভাল ভাইঝির রাধুনীগিরিতো পছন্দ করে?" তারা কি বলিবে? সে নিরুত্তর। জীবন-পত্নী কাছুকে ডাকিয়া বলিল "চলো কাঁদি বেলা হলো।"

তারামণি ও ভোলানাথের এই নিভৃতকথোপকথন কাহিনী নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া জীবন কর্ত্তৃক মহেশের কানে গিয়া পৌছিল। মহেশ দেখিল ভোলানাথের হাত হইতে তারাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে সে ফাঁকে পড়িবে। জীবনকে ডাকিয়া মহেশ পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় বসিল। ভবানী প্রসাদের সহানুভূতি থাকাতে তাহা সহজে সিদ্ধ হইবার নহে বুঝিয়া সে অপেক্ষাকৃত বাঁকা পথ ধরিল। জীবন বুঝাইয়া দিল তারামণির অর্থাভাব প্রচুর; ভোলানাথ বা তাহার ভ্রাতৃজায়া সে অভাব যত না মিটাইতে পারিবে মহেশ তদপেক্ষা বেশ পারিবে। কাজেই জীবন বলিল "প্রকাশ্যভাবে ভোলানাথকে বিড়ম্বিত না করিয়া তারামণিকে আশাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া এমন কি কৌশলে ঋণবদ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে হইবে; সম্ভব হয় ভোলানাথকে গ্রামান্তরে বেশী বেতনের চাকরীর লোভ দেখাইয়া পথ হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হইবে না।" মহেশ এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজী হইল। কাদু ঠাকরুণকে তারামণির সহিত সম্বন্ধ রাখিবার দূতী পদে নিযুক্ত করা হইল। এদিকে স্কুলের হেডমাষ্টারকে বিরলে ডাকাইয়া ভোলানাথের বিরুদ্ধে ছলছুতা ধরিয়া রিপোর্ট করিবার ভার দেওয়া হইল। ভোলানাথের চরিত্র যে সন্দেহযুক্ত এই কথা ইঙ্গিতে হেডমাষ্টারকে জানানো হইল। হেডমাষ্টার মহাশয় বহুদিন হইতে বেতনবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন; এতদিন সুবিধা করিতে পারে নাই; এখন তাহার মাথায় কার্য্য-সিদ্ধির উপায় যোগাইল। তিনি বুঝিলেন সেক্রেটারী বাবুর মনস্তুষ্টি করিতে পারিলে তাঁহার স্বার্থ সাধন সহজসাধ্য হইবে।

হেডমাষ্টার দিন বিলম্ব না করিয়া ভোলানাথকে নজরে নজরে রাখিতে লাগিলেন; প্রত্যহই একটা ছল ছুতা করিয়া অপদস্থ করিতে ছাড়িলেন না;

মাঝে মাঝে ভয়ও দেখাইতে লাগিলেন "আপনার কাজকর্ম্মে বড় শৈথিল্য ছাখছি যদি অ্যামনে চলেন, তা হলে রিপোর্ট করতি ছাড়মুনা বুঝ্যা চলবেন—।" হঠাৎ একদিন আধঘণ্টা লেট হওয়ার জন্য ভোলানাথ সস্‌পেণ্ড হইল। ভোলানাথের বুঝিতে বাকী রহিলনা, হঠাৎ এমনটী কেন হইতেছে।

সেদিন ভোলানাথ বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া কথা কহিলনা। যজ্ঞেশ্বরী ব্যাপার কি হইয়াছে জানিবার জন্য ভোলানাথের কাছে যাইলেন স্ত্রীর উপর রাগ এই :জন্য যে যজ্ঞেশ্বরীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করার সে আদপে পক্ষপাতিনী নয়। যজ্ঞেশ্বরী বুঝিলেন যে ঝিকেমেয়ে বৌকে জব্দ করার পলিসিতে এই রাগ। যজ্ঞেশ্বরী ভোলানাথকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। ভোলানাথ বলিতে বসিল।

ফলে তুচ্ছ একটা কথা লইয়া সে দিন দেবর ভাজে খুব একচোট একটা কলহ হইয়া গেল; ভোলানাথ রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিন আর বাড়ী ঢুকিলই না; যজ্ঞেশ্বরী চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে আসিয়া বসিল। সৌদামিনী মুখ ভার ও মন আঁধার করিয়া দাওয়াতে বসিয়া রহিল। কিরণের দেখিয়া শুনিয়া অসহ্য হইল; সে খুব রাগ করিয়াই মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে বসিল। বলিল—"এতেও তো মা তোমার লজ্জা হচ্চেনা তবু থাকৃতে হবে এখানে?"

য। বলি যাব কোন চুলোয় বল্?

কি। কেন মামার বাড়ী চল?

য। কি দায় দুঃখে ভাই ভাজের ভাত মাগ্‌তে যাব শুনি?

কি। এমনি করে কি এখানে থাকতে হবে? ভাতই বা মাগ্‌তে যাবে কেন? দু দশ দিন নিদেন না হয় মাস খানেক থাকৃলে? তার পর দাদা গুছিয়ে উঠ্‌লে না হয় বাসা করবো সব?

য। বাসা করে আলাদা থাকা তো? তা এখানেও তো হতে পারে? এ বাড়ীতে কি আমার অংশ নেই? স্বামী শ্বশুরের ভিটে থাকৃতে পরঘরি কেন হতে যাব শুনি?

কি। তাই না হয় করো? তোমার অসহ্য না হয় কাকারতো হয়েছে? এখনো বুঝতে পার না যে তুমি এখানে থাকাতেই ওঁর এত—

য। তুই থাম্। একসঙ্গে থাকৃলে ঝগড়াঝাটী হয় না? তোদের সঙ্গেই কি

কখনো কথা কাটাকাটি কি মনান্তর হবে না ? একদিন আধদিন একটু ঝগড়া হলে ঘর ছেড়ে পর হতে হবে ?

কি। এক আধ দিনতো নয়, এ যে নিত্যিকাণ্ড হয়ে পড়েছে ? তোমাকে উনি চান্ না তুমি গায়ে পড়ে থাকবে নাকি ?

য। হ্যাঁ থাকি যদি ? অপমান টা কিসে ? আপনার লোকতো ? এতো পরের গায়ে পড়ে থাকৃচিনি।

কি। আপনার যে এসব জায়গায় পরের বাড়ী হয়ে পড়ছে !

য। তাই বলুক না খুলে যে এক অন্নে থাকা হবে না আমি খুসী হয়ে আলাদা হেঁসেল করছি ; হাঁড়িই না হয় আলাদা হলো তাতে ওরা আমার পর হবে না তা ছাড়া তোর কাকা আমায় না চাইতে পারে সন্তুকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও সোয়াস্তি পাব না।

কি। কাকাই যদি অশান্তি ভোগ করেন তা হলে কাকীমা কি তোমার জন্যে তাঁর অশান্তি বাড়াবেন ? মোটকথা তোমার এখানে আর থাকা ভাল হচ্চে না।

য। খুব হচ্চে যা তুই, আমায় আর জ্বালাস্নি সব—

কি। আমরা জ্বালাচ্ছি না তুমিই সবাইকে জ্বালাচ্ছ ?

য। কিরণ তোদের কি তাই ই ধারণা ? (যজ্ঞেশ্বরী কাঁদিলেন)

কি। (লজ্জিত অনুতপ্ত হইয়া) না মাপ কর। বড্ড দুঃখে এই কথা বলছি আমাদের নয় তবে কাকার সংসারকে বটে ।

য। এখনি তোরা দু সংসার আলাদা ভাবছিস্ কিরণ আমি যে তা পারিনি, পারবোও না—তোরা না হয় মামার বাড়ী গিয়ে থাক্।

কি। আর তুমি এইখেনে থাক, কেমন ? মা কি আমাদের এমনিই ভাবো ? হ্যাঁ মা।

য। না তা নয়, তা নয় তোরা কেন অশান্তি পাস্ !

সন্তু সব শুনিতেছিল উঠিয়া আসিয়া কিরণকে বলিল—"কিরণ কেন দিদিকে চোখের জল ফেলাস্। যে অশান্তি সংসারে দেখা দিয়েছে তা যে আরো ওই পাপে আগুণ হয়ে উঠবে। দিদি মাপ কর তাকে তুমি না মাপ করলে—"

য। আচ্ছা পাগলতো সন্তু তুই ? আমি কি শাপ শলুই দিচ্ছি যে মাপ চাইছিস্—? বলি তুইতো দেখছিস্ সব কেন এমন হচ্চে বল দেখি ? আমি কতটা দোষী তাই যে বুঝতে পারছি নি।

সত্থ। এক বিন্দু না দিদি এক বিন্দু না! তোমাকে ঠিক মত চিন্‌তে পেরেছি আর পারছি এইটেই আমার বড় সান্ত্বনা আমি জানিনি কি বল্‌বো, কি করবো! তবে একটা কথা দিদি তুমি কোনো কথায় থেক না; কোনো কথাটীতে নয় হাঁ না ভাল মন্দ কিচ্ছু না—রোগ যে ওর কোথা আমি তাও বুঝতে পারিনি কি বোঝাব? কি পন্থা দেখবো আমার যে মাথান্তর হয়েছে দিদি। মনে হচ্চে দুমাস পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ী বসে থাকি!

য। তুই কেন ঘর দোর ছেড়ে পালাবি বোন্? আচ্ছা সত্থ একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি, মাথা খাস্ আমায় সত্যি বলবি; ঠাকুরপোর কি সত্যিই আন্তরিক ইচ্ছে আমি এখান হতে চলে যাই—? বা ভেন্ন হয়ে থাকি? আর কেনই বা এ ইচ্ছে?

সত্থ। ভগবান জানেন কেন এ ইচ্ছে তবে কথায় বোধ হয়; আমার দোষ নিওনি দিদি আমি তোমাদের সরিয়ে দিয়ে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সুখী হবো তা নয়—

য। না লো না তা ভাববনা আমি কি তোকে চিনিনি তুই স্বচ্ছন্দে বল্ কি ওর মনের কথা—

সত্থ কাঁদন্ মাদন্ হইয়া বড় যা এর হাতদুটী ধরিয়া বলিল—'ওরা ওঁকে শাসিয়েছে যে তুমি ভাজের সঙ্গে একান্ন থাক্‌লে গাঁয়ে ওঁর তিষ্ঠানো ভার হবে বাউনদের যে সে দিন অমন করে অপমান করতে পারে—তার সঙ্গে যার কোনো সংস্পর্শ থাকবে সেই ওদের শত্রু; দেখলেতো সে দিন স্কুলের হেড-মাষ্টার কিরকমেই না, ওঁর পেছনে লেগেছে—বলছিল কাল, চাকরী বুঝি থাকে না—"

য। চাকরী বিনি দোষে মারলেই হলো?

স। যাদের হাতে চাকরী তারা মারলে রাখেইবা কে দিদি? আর দেখছইতো ওর তেমন সাহস বা জোর আছে যে নড়বে?

যজ্ঞেশ্বরী অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন; ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা সত্থ! আমার অন্তত কিছুদিনের জন্য আলাদা হয়ে থাকা বা স্থানান্তরে যাওয়াই ভাল; সত্যিইতো কেন আমি ওকে আমার বিপদের জালে জড়াই? ওরা আমাকে জব্দ করবার জন্য নানান্ রকমে বিরম্বনা ঘটাবে আমি সে সব হীনতা স্বীকারও করতে পারবো না আর ঠাকুরপোকেও তাতে রাজি করতে পারবো না। কেন তবে মিছি মিছি ওর সুখের ঘর ভাঙ্গি। সুখের ঘর

গড়তে এসে যে এমনি করে ভেঙ্গে বসবো সে ভাল নয়—সেই ভাল আমি এই ভিটে ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে থাকি তবে গ্রাম ছেড়ে যেতে পারবো না যাবও না সদু; তোকে আর গোবুকে ছেড়ে আমি যমালয়েও গিয়ে সুখী হবো না। আমার দেহ মন যেমনি তোদের আছে তেমনি থাকবে—

সদু। কেন দিদি ভিটে ছাড়বে কেন? এ ভিটে কি আমার একলার? শ্বশুরের ভিটেতে তোমারও অধিকার কম কিসে? বরং বেশী বড়ঠাকুরের টাকাতেই তো এ ভিটে?

য। সে জানি সদু আমি যদি সত্যিই মনে জ্ঞানে তোদের ওপর শত্রুতা করে ভিন্ন হতাম তা হলে ভিটে ছাড়তাম না তবে কি না ঠাকুরপোর ধারণা আমা হতে দূরে থাকলে সে সংকট থেকে উদ্ধার পাবে তাই এই মতলব, দুদিন তাই থাকি সদু। পালডাঙ্গাতে একটা ঘর তুলে না হয় কিছুদিন থাকিগে?

স। তাই কি হয় দিদি। আবার খরচ করে আলাদা ঘর তুলতে যাবে কেন? সে কেমন ধারা হবে?

য। গোটাছুই কুটুরী! আছে আমার একটা মতলব—পরে জানবি; এই ভিটেতেই আমাকে ফিরে আসতেই হবে দেখে নিস্ সদু এ আমার বিশ্বাস আর মন নিচ্ছে যে আবার আমাদের এক সঙ্গে মিশতেই হবে আর বেশী দিন দেরিতেও না যেমন ছিনু তেমনিই থাকবো। এখন ঘর ভাঙ্গচে বটে কিন্তু এ ভাঙ্গা জুড়বেই জুড়বে একদিন ঠাকুরপো তার ভুল বুঝে বৌদিকে ফিরিয়ে আনতেই হবে—যখন চিড় ধরেছে তখন জোর করে তাকে চেপে ধরে জুড়তে যাওয়া ভুল; তাতে ফল উল্টাই হবে; এই যে ভুল বোঝা বুঝি আমাদের দেওর ভাজে এর একটা শেষ আছেই সদু; ভুলটাই সংসারে সবচেয়ে বড় নয় ঘুমের ঘোরে চোখের ঝাপসার মত ক্ষনিক; কেটে গেলে চোখ পরিস্কার হবে সত্যি যা তাই বড় হয়ে ফুটে উঠবে—

সদু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার স্বামীর মত আমিও দুর্ব্বল আর ভীতু, কিন্তু দিদি আমি তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পরম সাহস ভরসা পেয়েছিলুম; কিন্তু যার সঙ্গে আমার ভাগ্য বাঁধা সে যদি সে-সাহস, সে-ভরসা না পায় আমাকে বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গেই চলতে হবে—আমার দোষ নিওনি দিদি।" যজ্ঞেশ্বরী হাসিয়া সদুকে বুকে টানিয়া তার মাথায় চুম্বন করিয়া বলিল—"পাগল হলি সদু আমি তোকে বুঝিনি? এত

কথা তোকে বল্‌তে হবে কেন? যাতে তোরা নিরাপদ হোস্‌ আমি তাই-ই করছি আমার মনপ্রাণ ভালবাসা তার কি একবিন্দু হ'তে তোরা বঞ্চিত হবি? কোলের ছেলেটী বেঁচে থাকলে আজ গোবুর মত বড় হতো? গোবু আজ আমার সেই শূন্যস্থান দখল করে বসেছে; তাকে ফেলে যেতে পারি আর আমার একবিন্দু শক্তি নেই সদু! ওই আর একটা পরের ছেলেকে কিরণ আপনার করে বসে আছে—ওই বা যাবে কোথা?"

এমন সময় "জ্যাঠাইমা তুমি কি আজ আমাকে খেতে দেবে না" বলিতে বলিতে গোবরধন বাড়ীতে ঢুকিয়া ক্ষুধার শানে গলার স্বর কত ধারালো হইতে পারে তাহার পরিচয় দিল। কাছে আসিয়া কোলের উপর ধুপ করিয়া পড়িয়া বলিল "কি যে তোমরা কেবল কেবল কাঁদছ তা জানিনি খে—তে—দে—বে—কি না—বল—জ্যাঠাইমা—?" জ্যাঠাইমা গোবরকে বুকে চাপিয়া চুম্বনে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া বলিলেন—"চলো বাবা চলো—বাবা নয়তো সব শত্রু!—কেন এমন করে আমায় বাঁধলি বল্‌তো?" "বা রে বা কই বাঁধলুম? হ্যাঁ মা জ্যাঠাইমাকে আমি বেঁধেছি?" সদু আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে গেল। গোবর অবাক হইয়া জ্যাঠাইকে বলিল "হ্যাঁ জ্যেঠিমা মা কাঁদছে কেন?" জ্যেঠিমা বলিলেন "আমি মেরেছি।" গোবর হাসিয়া বলিল—"যাঃ তুমি মেরেছ! তাই বুঝি হয়!'

য। (হাসিয়া বলিলেন) হয় না? মারতে পারিনি?

গো। কখ্‌খনো না—

য। তবে কাঁদছে কেন?

গো। (চুপি চুপি) বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে—

কিরণ। কি ঝগড়া গোবু?

গো বাবা মাকে মামার বাড়ী যেতে বলছিল তা মা যাবে না তাই বাবা মাকে বকেছে—

য। চল্‌ ভাত দিগে খিদে পেয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরীর কত কি ভাবনা হইল। দেখিলেন স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত অশান্তিতে কাল কাটাইতেছে। তাঁহার মত স্থির করিতে আর বিলম্ব হইল না। সদু গোবরকে ডাকিলেন "ভাত খাবি আয়।" গোবর ডাক শুনিয়া উঠিয়া পড়িল। যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন "যা বা ভাত খেগে যা মা ডাক্‌ছে—।" গোবর চলিয়া গেলে যজ্ঞেশ্বরী বলিলেন, "কিরণ বিজুকে চিঠি লেখ্‌, এসে আমাদের নিয়ে যাগ

মাস খানেক কাশীপুরে গিয়ে থাকিগে, এর মধ্যে একটা ঘর তুলে এসে ঐ খানেই বাস করবো।"

কিরণ। ঘর আবার কেন মা? এতেও তো আমাদের ভাগ আছে?

ম। ঘর আসলে তোর জন্যে কিরণ—এইতো খান বারো কুটুরী ছেলে-পুলের বিয়ে থা হলে তোর মাথা গোঁজবার স্থান নেই আর আমার ইচ্ছে নয় মা, ভাই ভগরের অন্নদাসী হয়ে বিধবা বোনেরা থাকে—আলাদা থাকবি সম্ভাবও থাকবে—মা বোনের একমুঠো হবিষ্যি জুটে যাবে—কার মনে কি আছে মা কে জানে? ইহকালের সুখ সাধ তো ঘুচেছে যে কটা দিন থাকবি শান্তিতে থাকিস এই ইচ্ছে আমার—যাগ এসব কথা পরে হবে এখন পত্র লিখগে তোর দাদাকে। পরশুই এসে নিয়ে যায়—দিন ভাল আছে কোনো মতে বিলম্ব করে না যেন লিখিস্—। তিনি উঠিয়া কার্য্যান্তরে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"লিখিস্ আমরা যে যাবো তা যেন লোক জানাজানি না হয়…ভাইঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন এই বলতে হবে—তা না হলে শত্রুরা খুব নাচবে যে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে।"

* * * *

বিজয় পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইল। মা যে উপস্থিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিতে চায় ইহাতে সে খুসী হইল না মাস খানেক আগে হইলে হইত। মায়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে মাসখানেকের জন্য তাহার পল্লীবাস বন্ধ হইবে, সেই আশঙ্কাতেই সে সুখী হইল না; তাহার তরুণ জীবনাকাশের পূর্ব্বভাল যে সুখ-রবির গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার দর্শনানন্দ হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, এই তার ভয়; তবে মা যে আবার গ্রামে ফিরিবেন এবং সেখানেই বাস করিবেন এ আশায় সে আশ্বস্ত থাকিল। ছুটী ছিল না পাইবেও না; অথচ মাতৃআজ্ঞা পরশুই তাহাদের আনিতে হইবে। বিজয় সমস্যায় পড়িল; তারপর ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিয়া পঙ্কুকে পত্র দ্বারা এই কার্য্যটী সমাধা করিবার অনুরোধ করিল। কিন্তু চলিয়া আসার যে কারণ, পঙ্কুকে তাহা জানাইল না—পত্রে লিখিল মামাতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে আনা। মাকেও সেই ব্যবস্থার সংবাদ দিল। পঙ্কু পত্র পড়িয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইল; যে কিশোরীটীর…লজ্জামুগ্ধ…মুখের অরুণিমা ও চোখের স্নিগ্ধ কটাক্ষ…প্রথম দরশনেই তাহার হৃদয়বীণার গোপন তারে এমন অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন রাগিণী তুলিয়া দিয়াছে যে রাগিণীর অনাহত ধ্বনি

তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বের নূতনতর ও গভীরতর অর্থ শুনাইয়া দিয়াছে তাহাকে আর যে নবলব্ধ বন্ধুটির স্বভাব-মাধুর্য্য ও সঙ্গসাহচর্য্য তাহার পল্লী-জীবনের তিক্ততা নষ্ট করিয়াছিল তাহাকেও কিছুদিন দেখিতে পাইবে না। কিন্তু উপায় কি? বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা অপ্রিয় কার্য্য হইলেও করিতে হইবে। তবে জোর মাস খানেক এই বিরহভোগ এই যা সান্ত্বনা। পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে গিয়া বিজয়ের পত্রসংবাদ দিল। যজ্ঞেশ্বরীও খবর পাইয়াছিলেন।

যথাদিনে পঞ্চু উহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় রাখিতে গেল। তর্ক-সিদ্ধান্তের বাড়ীর নিকট আসিয়া পাল্কী থামাইয়া যজ্ঞেশ্বরী নামিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে গোপনে জানাইলেন, সিদ্ধান্ত মহাশয় বলিলেন "এই মতলবই ভাল, তবে ফিরে এস মা—জন্মস্থানে হাজার দোষে দোষী হলেও তোমাদের মত লোকের সংস্পর্শ হতে বঞ্চিত হলে আর তার কোনো কালে সদগতি হবে না। শুধু সেই জন্যেই মা এত লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেও মাটী আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি।" যজ্ঞেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করিলেন ফিরিয়া আসিবেন। কন্যাদের সহিত পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহারা পাল্কীতে চাপিলেন।

গ্রামের লোকে জানিলেন যজ্ঞেশ্বরী ভাইঝির বিবাহে কলিকাতা গেলেন। সদুও আসল মতলব চাপিয়া গেল। মনে যার পর নাই ব্যথা পাইয়া সে শুইয়া রহিল। সেদিন ভোলানাথ কোনো এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে পড়িয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল; সদু প্রথমে উত্তর না দিয়া পরে বলিল—"ভালইতো হয়েছে, কদিন হতে তুমি তো চাইছই তাই!" ভোলানাথ বিরক্তভাবে বলিল "ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল তা কেহ জিজ্ঞাসা করছে না—তবে এমন করে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" সদু বলিল, "বেশতো এইবার সম্ভব হবে।" ভোলানাথ উত্তর করিল —"তোমার যদি এতই দরদ হয়েছিল তুমিও গেলে পারতে—।" "পারলে কি বলতে হতো তোমায়? তুমি নিশ্চিন্ত হলে, কিন্তু আমি জানলুম যে ঘরের লক্ষ্মী হারালুম—এইটে জেন যে সব যায়গায় স্ত্রীলোকেই ঘর ভাঙ্গে না, স্বামীকে ভাই ভাজ থেকে ভেন্ন করে না; এটা তোমার মত পুরুষেরই দ্বারা হয়ে থাকে। উপলক্ষ হয় শুধু আমার মত হতভাগীরা।" এই বলিয়া সৌদামিনী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভোলানাথ মর্ম্মে মর্ম্মে নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জিত হইলেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া স্বস্তিবোধ করিল। (ক্রমশঃ)

উদ্বোধন

[শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী]

আয়রে বাঁধন-কাটা রঙিন্ নবীন সাধক দল,
মায়ের বুকের কলজে-ছেড়া যে গান আজি উঠ্‌ছে বেজে
তোরা শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি ওরে শুন্‌বি তোরা চল।
মেঘ-ছুটা আজ উষার গগন দেখ্‌না চেয়ে ওরে,
অঙ্গনে যে ফাগ লেগেছে, শিশিরবুকে জাগছে তৃণ ভোরে,
ওরে টুটা আগল দোরে।
বিহগ-কুলায় নূতন গীতি,
ভয় ভেঙেছে মায়ের প্রীতি ;
আজ মিলেছে খোঁজা বীথি,—
মায়ের ছেলে মায়ের বুকে আয়গো।
রঙ চঙে ও কথার মোহে ভুলিস্‌নেরে তোরা,
আপন গেহে উজল-স্নেহে বাঁধরে বুকে বল ॥
মিলন যাদের নাইকো ঘরে বিশ্বপ্রেমে মাতলে হাসি পায়,
কাঙাল যারা আপন দোরে পরের দেশের আন্‌বে অতিথ হায়!
হেলা-ঠেলা পল্লী তোদের ডাকছে—'ওরে আয়' ;
শিল্প তোদের মরে আছে জাগিয়ে দেরে তাই।
ফিরে পা'বি লুপ্ত তোদের তপোবনের ঋদ্ধি হ'তে
ফোটা মহান্ ফল।
তোরা শুনিসনেরে ছল!!
ভুমার লাগি ভুখা হৃদয় যার,
দলন-নীতি করবে কি ভাই, তার?
গোপন কারায় আজ লেগেছে আলো,
অমারাতি করবে কি আর কালো?
মরার মত মরতে হ'লে বাঁচার মত বাঁচতে হবেগো,
মামুলীও মনভুলানো 'বিশ্বপ্রেমে' বাদ পরে কি
তোদের আঙিন-তল?
ও সব জ্ঞানের ঝলমল,
ওরে নবীন সাধক দল!

ভুলভাঙ্গা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

১

'বাবা মা মত দিয়েছেন বল্‌চো, তবে আমার মতের দরকার?'

'রাগ করোনা লক্ষ্মীটি, একবার শুধু হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও!'

'যাও—যাও, পুরানো অভিনয় রেখে দাও, পথ ছাড়ো—কাজ আছে, ভালো বিপদ সকালবেলা!'

'ওঃ! আমি তা হলে তোমার একটা বিপদ! এতদিন তা বুঝিনি, তা বিপদ নিয়ে ঘর করবার দরকার কি? বালাই একেবারে দূর করে দিয়ে একজন সম্পৎ নিয়ে এলেই চুকে যায়!'

'আচ্ছা কে তোমায় সকালবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ডেকেছিল বল দেখি? আমি কি তোমায় কোনো কথা বলেছি? তুমি যাবে বাপের বাড়ী—জরুরী তাগাদা, বোনের বিয়ে—আমি কোনো কথা বলতে যাবো কেন? আমি বল্‌লেই বা তা শুনবে কে?'

'শোনো লক্ষ্মীটি, রাগ করোনা। একটী মাত্র বোন, তার বিয়েতে আমোদ আহ্লাদ করতে নিয়ে যাচ্চে, যাবোনা তা হলে?'

'তোমার সখের প্রাণ—আমার কোন কথাই আর তোমার শুন্‌তে হবে না।'—এই বলিয়া সবেগে নরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। অনিলা ছুটিয়া জানালার কাছে লুকাইয়া কাঁদিতে বসিল।

বিপুল অশ্রুধারায় তার ঠোঁটের অলক্তরাগ উঠিয়া গেল, মান্দ্রাজী শাড়ী ভিজিয়া গেল, সে একবার মনে করিল যে তার কাকাবাবুকে ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো, আবার কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গেল।

শাশুড়ী পুত্রবধূকে তার কাকার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। সারা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও নরেন্দ্রনাথের দেখা মিলিল না।

নরেন্দ্রনাথ একেবারে আফিস যাইবার সময় মাতা মহামায়ার কাছে আসিল। মহামায়া রান্নাঘরে ডাল সিদ্ধ করিতে গিয়া নামাবলী গায়ে আহ্নিক করিতেছিলেন। কর্ত্তার তখনও স্নানাহার হয় নাই, তিনি বাড়ীর ভিতরে

একটুকরা জমিতে কত আলু ফলাইতে পারা যায়, তাহা লইয়া বিশ্বম্ভর মণ্ডলের সঙ্গে আলোচনা করিতে ছিলেন। বামাচরণ বাবু সদাশয় মানুষ,—সকলে তাহাকে কৃপণ বলিত বটে, কিন্তু তিনি প্রাণপণে সকলের উপকারই করিতেন।

'মা, বাবা আজ কাছারী যাবেন না?'

'হাঁ, বাবা, যাবেন বৈকি। তোর খাবার সময় হলো, তুই খাবি কখন, নরেন?'

'এই যে মা, দাও দুটী খেয়ে নিই। পাপ বিদেয় হয়েছে ত?'

'ষাট—ষাট! অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে! সিথের সিঁদুর, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। আমার যত চুল—

'আচ্ছা, এত ঘন ঘন যাতায়াতের দরকার কি? একেবারে সেখানেই আড্ডা নিলে হয়। দেখচো মা, বাবার কাণ্ড! ঐ একরত্তি জমি, ঐখানে উনি হাজার মণ আলু ফলাবেন! আচ্ছা এত টাকা খাবে কে?''

এক পুত্র কিনা—তাই নরেন্দ্রনাথের এত আদর। বামাচরণ বাবু তিনটী কন্যাই বহুদিন পূর্ব্বে সুপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন। পিতাপুত্র দুইজনেই বেশ উপায় করেন। তিন বৎসর হইল, নরেন্দ্রনাথের এক ধনীগৃহে বিবাহ হইয়াছে। বড়লোকের মেয়ে অনিলা, দেখিতে একেবারে দেবকন্যা, অথচ একটুও গর্ব্ব নাই। সকলেই তার রূপগুণের সুখ্যাতি করে। কিন্তু এই তিনবৎসরে হয়ত মাত্র তিনবার নরেন্দ্রনাথ অনিলাদের বাড়ী গিয়াছে। তাহাও শ্বশুর সঙ্গে করিয়া লইতে না আসিলে যায় নাই। তাহার মত, যার যেমন অবস্থা তার সেই রকম থাকাই ভালো। এম, এ, বি, এল, পাশ করিলেও ধনী সেশন্‌স্ জজ্ শ্বশুরের উমেদারী ও সুপারিশে সে মুনসেফী-পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়বাজারে দালালী করিতেছে। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধ দেখিয়া অনিলা মনে মনে বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিত। সেইজন্য সে সহজে বাপের বাড়ী যাইবার নামও মুখে আনিতনা। কিন্তু পরশু যে ছোট বোন প্রমীলার বিবাহ—সে বিবাহে না গেলে লোকে কি বলিবে?

২

সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া নরেন অন্যদিনের মত আর বেড়াইতে গেল না। শয়নগৃহের টেবিলে একখানা সদ্য প্রকাশিত ফরাসী নভেল লইয়া পড়িতে বসিল। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, কলিকাতা সহরের বায়ুমণ্ডলটা একটা ঘন

ধূমের আবরণে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। নরেন ক্রমশঃ চিন্তার ভারে এতই অবসন্ন বোধ করিতেছিল যে সহরের অনন্ত কোলাহল, ট্রামের শব্দ, ফিরিওলা-গণের ধূতরব, মোটরের হৃদয়বিদারী গর্জ্জন—তাহার চিন্তার সমুদ্রে সব ডুবিয়া গেল। সে দেখিল টেবিলে ছুটো মাথার কাঁটা পড়িয়া আছে। তাহা একবার চকিতে নাসিকাগ্রে ধরিল, ক্রমে তাহার মনটা আবেগে বিভোর হইয়া উঠিল, সে গত রজনীর ব্যবহৃত শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া একেবারে শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল। ঐখানে তাহার ট্রাঙ্ক ছিল, এখন সেখানটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা, ঐখানে তাহার নীলাম্বরী, খড়কে-পাতা শাড়ী, সেমিজ ও ব্লাউজ থাকিত; সন্ধ্যার সময় শঙ্খধ্বনি করিয়া আসিয়া ঐখানে তাহাকে কত নমস্কার করিত; আর ঐ চেয়ারের পার্শ্বে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কতবার আসিয়া সে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া গিয়াছে। সমস্ত কক্ষটী অনিলার মধুর স্মৃতিগন্ধে ভরপুর হইয়া আছে। কিন্তু আজ সে কোথায়? যে এত ভালবাসার নিদর্শন দিয়া গিয়াছে, সে কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? কেন, কাল যাইলে কি চলিতনা? যাহাকে অত সুন্দর দেখিতে, তার কি পাষাণ দিয়ে গড়া হৃদয়! এদিকে তাহার একদিন বেড়াইয়া ফিরিতে দেরী হইলে অনিলার ক্রোধের সীমা থাকিত না। আর আজ সে তাহাকে কাহার কাছে রাখিয়া গেল? যাইবার সময় চোখ ছুটী কি একবার ছলছলও করিল না? অথচ এদিকে সে কাজের দায়ে কতবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে, আর প্রতিবারই অনিলা কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। এ সবের অর্থ নরেন্দ্রনাথ মোটেই বুঝিলনা। সে ভাবিল, নারী মাত্রেই স্বার্থপর, বিলাসের দাসী। যেখানেই অসার ও ক্ষণিক আনন্দ, সেইখানে নারীই অগ্রণী। ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে নাই। ও-সব কবির কল্পনা। আবার ভাবিল এত কষ্টইবা কিসের জন্য? যে তাহাকে চায় না, সে-ই বা কেন তাহার জন্যভাবিয়া মরিবে? যাক্, আর সে অনিলার কথা ভাবিবে না, অনিলা বলিয়া এ জগতে কেহ ছিল না।

৩

নরেন্দ্রনাথের শ্যালক আসিয়া বিবাহ বাড়ীতে তাহাকে লইয়া গেল। সে নানারকম ওজর আপত্তি তুলিল, কিন্তু বৃদ্ধ বামাচরণের আদেশ হইলে আর সে দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না।

সে রাত্রে বিবাহ-সভা গুলজার। নূতন বর একে জমীদারের পুত্র দেখিতে তাহারচেয়েও সুন্দর। বিবাহ-সভায় সকলেই ব্যস্ত। সকলে তাহাকে

অন্দরে পাঠাইয়া দিল। তখন নূতন জামাতার বরণ হইতেছে। অনেক সুন্দরীর সমাবেশ হইয়াছে। এসেন্সের ও ফুলের নিবিড় গন্ধে সেই বিদ্যুদালোকিত প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গনটী ইন্দ্রপুরীর মত হইয়াছে। দূরে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে সে বরণ দেখিতেছিল। ভয়ত্রস্তা বধূবেশা প্রমীলা বরের সম্মুখে গোলাপী চেলী পরিয়া অবনতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। আর চারিদিকেই তরুণীদের কোলাহল ও জনতা,—যেন কি-একটা অনেক কালের হারানো দুর্লভ জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, এমনি ভাব। নরেনের চক্ষুও সেই ভিড়ের মধ্যে যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। ঐ যে খয়ের রংএর সিল্ক সাড়ীপরা হাস্যমুখরা চঞ্চল মেয়েটী! বরের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছে।—ঐ যে সপ্রতিভ বর মহাশয়ও কি-একটা বেশ জবাব দিলেন—সকলে খুব হাসিয়া উঠিল, শুধু ওই মেয়েটীই যেন লজ্জায় ভিড়ের ভিতর সরিয়া গেল। ঐ যে ঐ যে! নরেন্দ্র সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

সে বেশ বুঝিল, নূতনের আগমনে পুরাতনের অমর্য্যাদা অবশ্যম্ভাবী। তাহার বিদ্যা ও চরিত্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ত এই বরের মত রূপের ও টাকার ঝলক্ নাই। বর ইন্দুপ্রকাশ তাহার মত রসবর্জ্জিত অকবি নয়,—কেমন চুলের পারিপাট্য, বেশের অভিনবলীলা, কেমন কবিত্বময় ভাবভঙ্গী। সকলেই ইন্দুপ্রকাশের সারল্য ও রূপের প্রশংসা করিতেছে। শেষে অনিলাও তাহা দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল! এতদূর নরেন্দ্রনাথ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

নরেনের শাশুড়ী তাহাকে যত্ন করিয়া আহারাদি করাইলেন। তারপর বাসরঘরের পালা। গৃহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ঘরে খুব পুরু কারপেট বিস্তৃত একপ্রান্তে সুসজ্জিত, মাল্যদানবেষ্টিত, আলোকমালা মণ্ডিত 'খোপে' বর ও কনে, আর তৎসমক্ষে নানাবয়সের নারী একটা প্রকাণ্ড হারমোনিয়ম লইয়া বসিয়াছে। নরেন পার্শ্বের কক্ষ হইতে সব শুনিতেছিল।

'হাঁ বর তোমার শালী কোন্‌টা জানো ত?'

'খুব জেনেছি—যে গাল টিপে ধরেছিলেন! দিদি, শুনুন, এখন পালিয়ে গেলে চলবে না, এখন আমার ব্যথা সারিয়ে দিয়ে যান।'

অনিলা হাসিয়া বলিল, "না ভাই বর, আমাকে আর সারাতে হবে না, গালের অসুখ গালেই সারে—ঐ যে তোমার বাম পাশেই ঔষধ!"

প্রমীলা গুণ্ঠনের আড়াল হইতে অনিলাকে মস্ত বড় একটা কিল দেখাইল।

লাবণ্য বলিল, 'ভাই বর, একটা গান শোনাও!'

চারু বলিল, 'হাঁ ভাই, তোমার কথাই যখন এত মিষ্টি, না জানি গান আরও কত মিষ্টি!'

বৃদ্ধা ঠানদিদি বলিলেন, হাঁ দাদা, আগে তুমিই আরম্ভ করো, নইলে বাসর জমবে না।

ইন্দু বেশ ছেলে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে হারমোনিয়ম কোলে তুলিয়া প্রমীলার দিকে মুখ ফিরাইয়া গাহিল—

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি!
তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনি!' ইত্যাদি।

গানের সুরলহরী সেই গন্ধাকুল কক্ষে ভাবের তুফান তুলিল। বয়োবৃদ্ধারা তেমন তারিফ্ না করিলেও অনিলা শতমুখে ইন্দুর সঙ্গীতনৈপুণ্যের প্রশংসা করিল। বেচারা প্রমীলা মাধবীরাতের মোহমুগ্ধার মতই সে ইঙ্গিতে ধরা পড়িয়া গেল—একবারে চিরজীবনের মত। তারপর ইন্দু অন্য সকলকে গাহিতে বলিল।

'আচ্ছা, তুই না বরের শালী, তুই গাইবিনা ত গাইবে কে?'

'না, দিদি, আমি গান জানি না, আমায় মাপ করো।' তার মনে হইতেছিল—নরেন্দ্রনাথের সেই গম্ভীর আদেশ।

সুহাসিনী বলিল, 'না তোকে গাইতেই হবে, ইন্দু একবার বলতেই কথা রাখলে আর তুই যে একেবারে নাছোড়বান্দা!'

ইন্দু বলিল, 'হাঁ, এখানে গাইতে আর আপত্তি কি, এখানে ত আর আপনার ভয় করবার কেউ নেই!'

নরেন্দ্রনাথ ঘরের ভিতর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। সে শাশুড়ীর নিকট অসুস্থতার ছল করিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে।

অনিলা ভাবিতে লাগিল—বাস্তবিক কি গান গাহিবে সে!

'আচ্ছা, আমি গানই জানি না—কি গান গাইবো!'

ইন্দু ধরিয়া বসিল, 'না, সে কথা শুনচিনি, শিকারী বেরালের গোঁপ দেখলেই চেনা যায়। তাই নরেন বাবু আপনাকে ছাড়তে চান না, সে খবরটুকু আমি আপনাদের বাড়ী এসেই একটী ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়েচি।'

ছিঃ ছিঃ, অনিলার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল।

অশেষ আগ্রহের পর অনিলা গান গাহিতে রাজী হইল। ইন্দু হারমোনিয়মে সুর দিতে লাগিলেন।

প্রথমে চাপা গলায় অনিলা ধরিল—

'হৃদি বাঁধিয়া কেন নয়ন জল
দাওনা সখা মুছিয়া।
'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া
(তুমি যাওনা কেন ভুলিয়া)।
কাতর প্রাণে ব্যাকুল হৃদয়ে
মিছে কেন ঘর ঘুরিয়া।
তুমি অমন করিয়া মুখেরি পানে
থেকোনা শুধু চাহিয়া
(তুমি থেকোনা সখা চাহিয়া)।'

বড় সুন্দর—বড় সুন্দর! সঙ্গীত ভক্ত ইন্দুও শেষ লাইনের সকরুণ সুরটী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রীত হইল। নরেন ভাবিল—এতদূর? আর এদিকে আমি কতবার পায়ে ধরিয়াছি একটী গান গাহিবার জন্য বেশ, যথেষ্ট হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই পার্শ্বের দ্বার দিয়া নরেন্দ্র বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। বাহিরে গিয়াও তাহার গানের এক লাইন মনে পড়িতেছিল—

'সে যে অতীতের স্মৃতি বিরহের গীতি
যাওনা কেন ভুলিয়া' ইত্যাদি।

৪

প্রমীলার বিবাহের পর প্রায় কুড়ি দিন কাটিয়া গিয়াছে। অন্যবারে অনিলা বাপের বাড়ী গিয়াই চিঠি দিত, কিন্তু এবার কোনই সাড়াশব্দ নাই। নরেন্দ্র আরও ক্রুদ্ধ হইল। সে ভাবিল,সে অন্ধকারের জীব,—যাহারা আলোকের রাজ্যে বাস করে, তাহাদের কাছে তাহার আঁধার স্মৃতি যে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত। বর্ষার উচ্ছ্বসিত নদী যেমন আপন অন্তঃস্থলে মাটী কাটিয়া চলিয়া যায়, তেমনি অব্যর্থভাবে এই ধারণাটা নরেনের বুক চিরিয়া চিরিয়া গভীর হইয়া রহিল। মহামায়া দেখিলেন, ছেলের আর কোনও বিষয়ে তেমন অনুরক্তি নাই, তাহার মুখে সে দীপ্তিময় হাসিও নাই, সামান্য কথায় আজকাল সে বড়ই রাগিয়া যায়। তাহার শয়নগৃহ হইতে নরেন অনিলার স্মৃতি যথাসম্ভব মুছিয়া

ফেলিয়াছে। আজ সে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। আহারাদির পর তাহার খুব জ্বর আসিল। মহামায়া ও রামচরণ অত্যন্ত ভাবিত হইয়া পরদিনই অনিলাকে আনাইতে পাঠাইলেন।

প্রভাতের অরুণ কিরণ যখন ঘরের ভিতর নির্ম্মল হাস্যের মত প্রবেশ করিয়াছে, তখন যাতনায় অধীর হইয়া নরেন ডাকিল 'মা গো, একটু জল।' দ্বিপ্রহরের জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে বিভ্রান্তমনে উত্তেজিত হইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পরই অনিলা আসিল। সে জানেনা যে নরেনের অসুখ করিয়াছে। শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিতে গিয়া নরেনের কক্ষে ব্যাপার দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মহামায়া বলিলেন, 'একটু চুপ করে শোও, বাবা। এই যে অনিলা মা এসেছে। দেখ বাবা।'

নরেন্দ্র প্রলাপের মতই বলিল, 'না, অনিলা, কিছুতেই গান গেয়ো না। ইন্দুকে কি এতই সুন্দর দেখতে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও গান শিখবো এবার থেকে, দেখো—দেখো'।

মহামায়া উঠিয়া গেলেন। অনিলা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

অনিলা বেশ বুঝিতে পারিল কিসের জন্য নরেনের এই অসুখ করিয়াছে। সে সহসা উঠিয়া নরেনের পদধূলি লইয়া সেই জ্বরতপ্ত পা দুখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'ওগো, জন্মে জন্মে যে তোমাকেই চেয়েছি। সে-সব লোক-দেখানো আনন্দ—তাহার ভিতর কি প্রাণ ছিল? তুমি আমার দেবতা হইয়া এ কথা বুঝিলে না? হে মদনগোপাল, এই বুকের রক্তে তোমার চরণযুগল ধুইয়া দিব, আমার স্বামীকে নীরোগ করিয়া দাও, প্রভু!'

মদনগোপাল জীউ অনিলার কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। সপ্তাহ পরে নরেন্দ্রনাথ পথ্য পাইয়া সুস্থশরীরে সন্ধ্যা বেলায় যখন হাসিতে হাসিতে অনিলার সযত্নরচিত কবরীটি নির্ম্মম ভাবে বিস্রস্ত করিয়া দিল, তখন অনিলা বলিল, 'এই বুঝি আমার পুরস্কার? না, এটা আমার দোষের শাস্তি?'

'না, না, অনিলা, এটা পুরস্কার, আর এই শাস্তি' বলিয়া অনিলার কম্পমান আরক্তগণ্ডে নরেন্দ্রনাথ সস্নেহে চুম্বন করিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লাহোর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেপরিচিতদের মধ্যে যাঁহাদের সহিত দেখা শুনা করিয়াছিলাম তাঁহাদের একজনের বিষয় এখানে কিছু বলিয়া রাখিতে চাই। ইনি বোধ হয় ঠিক পাঞ্জাবী ছিলেন না। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস যুক্ত-প্রদেশেরই কোন স্থানে হইবে। তবে এখন পাঞ্জাববাসীই হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইঁহার আচার ব্যবহার সব পাঞ্জাবী ধরণেরই হইয়া আসিয়াছিল। নিজের পূর্ব্ব পরিচয় নিজে না প্রকাশ করিলে ইনি যে পাঞ্জাবী নন এইরূপ ভ্রম কাহারও হইবে না। অনেক বাঙ্গালীই বাঙ্গলাদেশের বাহিরে বসবাস করিতে-ছেন, কিন্তু ইঁহারা নিতান্ত শীঘ্র শীঘ্র নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলেন না। তিন চার পুরুষ অথবা আরও বেশী দিন বিদেশে বসবাস করিয়াও অধিকাংশ স্থলেই ইঁহারা ঠিক বাঙ্গালীটিই থাকিয়া যান, বরং সে সকল স্থান বাঙ্গালীদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ বিশেষে পরিণত হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা দেখিয়াছি, ঐরূপ অবস্থায় বিদেশে বসবাস করিতে করিতে খুব শীঘ্রই নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া একেবারে সেই সকল দেশের লোক হইয়া পড়েন। যাহা হউক কাশী ফিরিবার পূর্ব্বে ইঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় ইঁহার ভিতর একটু সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া-ছিলাম। ইনি নানা কথার পর দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে বাঙ্গলাদেশ ঐ সময় তাঁহাদিগকে মোটেই অর্থের সাহায্য করেন নাই যদিও সেই মামলাতেই বসন্তকুমারের জন্য টাকা ও ব্যারিষ্টার প্রেরিত হইয়াছিল; এইরূপ আরও কিছু কিছু অভিযোগ তিনি বাঙ্গলার বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। আমি যদিও সে সময়কার সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে জানিতাম না, কারণ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি ঐ দলে প্রবেশ করি, কিন্তু আমি যাহা জানিতাম সেই অনুযায়ীই বলিলাম যে আমরা দল হইতে কাহাকেও কিছুই সাহায্য করি নাই, এবং টাকা ও ব্যারিষ্টার যে পাঠান হইয়াছিল তাহা বসন্ত বাবুরই কোনও বিশেষ বন্ধু নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ঐরূপ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। পাঞ্জাবের নবীন শিখদলের বিষয় ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, যেন

এবিষয় ইনি কিছু জানেন না এইরূপ ভাবে উত্তর দিলেন, অথচ যাহা বলিলেন তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে এই দলের বিষয় ইনি নিতান্ত যে কিছু জানেন না তাহা নহে, তবে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। অথচ এই দলে তাঁহার নিকট হইতে এসকল বিষয় জানিবার অধিকার আমার ছিল। ইঁহার বলিবার ধরণে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছিল যে এই শিখদল নিজেদের খেয়ালমত সব কাজ করিয়া যাইতেছে, ইহারা কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা রাখে না। অর্থাৎ কিনা "বাঙ্গলাদেশ! তুমি আবার কেন ইহার মধ্যে মাথা গুজিতেছ?" রাসবিহারী এ সময় পাঞ্জাবে আসিলে কাজের সুবিধা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন হাঁ তিনি ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম "হাঁ, ইচ্ছা করিলে।" দেখিলাম রাসবিহারীকেও এদিকে আনিবার ইঁহার বিশেষ আগ্রহ নাই, অথচ ইনি রাসবিহারীর সহিত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। কয়েকজন শিখ দলের নেতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করায় বলিলেন যে তেমন শিখ নেতাদের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই, অথচ ইতিপূর্ব্বে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে লাহোর হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি ইহাদিগকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন। যখন তিনি এইরূপে শিখদলের অনেক কথা আমার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন আমি কিন্তু তখন মনে মনে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম।

অহংকে যতই দূরে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি না কেন, অহং ভাব কতরূপেই না আমায় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এইরূপে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক ইহার সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, পাঞ্জাবীরা সকলেই এইরূপ ছিলেন। বরং যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন তাঁহারা অন্যদেশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালীকে যেন অধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং আমার মনে হয় অন্যান্য প্রদেশবাসীর অপেক্ষা এমন কি অনেক পাঞ্জাবীর অপেক্ষাও শিখেরা যেন বাঙ্গালীদের প্রতিই একটু অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। আমার বোধ হয় সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে যাঁহারা থাকেন না তাঁহারাই সমালোচক হন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটিও আমাদের কার্য্যে অনেক সময় অনেকরূপে সাহায্য করিতেন বটে কিন্তু মোটের উপর যেন আমাদের নিকট হইতে একটু দূরেই থাকিতেন। সেইজন্য আমরাও উঁহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিতাম না; তবে এই সময় পাঞ্জাবের ভিতরকার অবস্থা জানিবার জন্য সকলকার

নিকটই যাওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। বিপদে পড়িলেও ইনি যে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবেন না এতটা বিশ্বাস ইহার উপর অবশ্যই ছিল এবং সে বিশ্বাস যে ঠিক ছিল তাহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কারণ তিনি বিপদেও পড়িয়াছিলেন যথেষ্ট।

যাহা হউক বিপ্লবায়োজনের এক অভিনব পর্ব্ব আরম্ভ হইল ভাবিয়া কাশী অভিমুখে লৌহযানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম। কেবল থাকিয়া থাকিয়া ইহাই মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে কাশী গিয়া পঁহুছিব, কতক্ষণে রাসুদাকে গিয়া সকল কথা বলিব।

পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া ইহা বুঝিয়াছিলাম যে খুব শীঘ্র এই নবীন শক্তিকে সংহত ও সুসম্বদ্ধ করিতে না পারিলে হয়ত এই শিখেরা অসময়ে একটা এমন কিছু করিয়া বসিতে পারে যাহাতে সকল শক্তি সকল উদ্যম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—তখন কে জানিত যে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও, এত সন্তর্পনে এত সংযতভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াও পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে—অবশ্য এজগতে কিছুই ব্যর্থ হয় কিনা সে আলোচনা এখন করিলাম না।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথেই স্থির করিয়াছিলাম যে যত শীঘ্র পারা যায় দাদাকে এদিকে পাঠাইয়া দিতে হইবে, এবং আমাদের অঞ্চলেও সৈনিক-দিগের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। এতদিন কেন আমরা এই দিকে মন দিই নাই তাহা পরে বলিব। আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম যে দাদাকে এইদিকে পাঠাইয়া আমি বাঙ্গলাদেশে চলিয়া যাইব। বহুদিন হইতেই আমার বাঙ্গলাদেশে গিয়া কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। আমি এবিষয় দাদাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে তিনি মোটেই মত দিতেন না।

পাঞ্জাব ছাড়াইয়া যুক্তপ্রদেশের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিয়াছে; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার কামরাটীতে যাত্রী বড় বেশী কেহ ছিলেন না। বোধ হয় আমরা তিনচারিজন হইব। সে সব দিনে বোধ হয় জগতে এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা না হইত। পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় হইতে হইতে ইউরোপের মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিল। আমার একটি সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহাদের গ্রাম হইতে সৈন্য সংগ্রহ কিরূপ চলিতেছে। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে সেনাদলে লোক সংগ্রহ আজ-কাল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যদিও অনুনয় বিনয় ও

প্রলোভনের অন্ত নাই। প্রথমতঃ মাসিক বেতন খুব উচ্চহারে দেওয়া হইবে এবং একমাসের বেতন অগ্রিম পাইবে এইরূপ বলা হইতেছে। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছেন। যাহারা এইরূপ লোক সংগ্রহ করিয়া দিতেছে তাহাদিগকে খুব উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এত করিয়াও লোক পাওয়া যাইতেছে না? সৈনিক হইবার সামর্থ্য আছে এমন পুরুষেরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম তাহা হইলে বোধ হয় লোক সংগ্রহ একেবারেই হইতেছে না? উত্তরে তিনি বলিলেন, যে নিতান্ত যাহারা একেবারে গর্দ্দভ, প্রলোভনে পড়িয়া প্রথমতঃ তাহারা সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে স্বীকার করিতেছে ও পরে যখন সৈনিকের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তখন তাহারা সৈনিক দল ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারিতেছে না, এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া অনেকে পলায়ন তৎপর হইয়া পুনরায় পুলিশের কবলে লাঞ্ছিত হইতেছে।

পাঞ্জাবের অবস্থাও ঠিক এইরূপই শুনিয়াছিলাম, সেখানে নাকি সৈন্য সংগ্রহ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

এই সময় কিন্তু আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কি রেলে, কি পথে ঘাটে সকলস্থানেই অশিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে তীব্র ইংরাজবিদ্বেষ যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। একদিন কাশীর একটি প্রান্তর কোনের ইঁদারায় বাঁধান সানের উপর বসিয়া একটি হিন্দু স্থানীর সহিত আমাদেরই কোনও কাজের কথা লইয়া আলোচনা হইতে ছিল। অদূরে একটি চাষী ঘাস কাটিতেছিল। এক সময় দেখি সে আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; একটু পরে ঘাস কাটিতে কাটিতে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু! ইংরাজ রাজত্ব থাকিবে কি না?" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি মনে হয়?" সে বলিল "বাবু! এবার ইংরাজ রাজত্ব আর থাকিবে না, ইহাদের সময় হইয়া আসিয়াছে।" "বাবু জার্ম্মানরা কতদিনে আসিবে।" আমরা তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম জার্ম্মানরা আসিলে আমাদের কোনও লাভ নাই; কিন্তু সে পুনরায় বলিল—"না বাবু! ইংরাজেরা আর ন্যায়ধর্ম্ম পালন করছে না, এদের এখন যাওয়াই ভাল"। ইহার পরে আমাদের যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছিলাম, এখন তা না বলিলেও চলিবে। এই সময় দেখিয়াছি বাবুরা ইহাদের কথায় সায় না দিলে বাবুদের উপর ইহারা অসন্তুষ্ট হইত।

পাঞ্জাব মেল কাশীতে বেলা তিনটার সময় আসিয়া পঁহুছায়। আমার

উপর আবার সে সময়ে পুলিশের খরতর দৃষ্টি। ভোর বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত পুলিশ বাড়ির দরজার সম্মুখে অথবা নিকটেই কোথাও বসিয়া থাকিত ও বাড়ির বাহির হইলেই আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ম ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বাড়ির বাহির না হইলেও আমার সহিত দেখা শুনা কাহারও পক্ষে নিরাপদ ছিল না, কারণ আমার সহিত যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা পুলিশের নজরে পড়িবে তাঁহারই দশা আমার মত হইবে। সেই জন্ম সে সময় আমাদের মত লোকের সহিত সহজ সরলভাবে মেলামেশটাও দোষের মধ্যে ছিল। এইরূপ কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়াও আমাদের সকল রকম কাজই করিতে হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ হইতে বোমা ও রিভলভার ইত্যাদি কাশী অঞ্চলে আনা আবার এই দিক হইতে এই সব পাঞ্জাবে বিভিন্ন প্রদেশে লইয়া যাওয়া, এ সবই এইরূপ কড়া পাহারা সত্ত্বেও করা হইয়াছে। পুলিশের চোখে ধুলা দেওয়াটা আমরা মোটেই কঠিন কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম না। কি করিয়া আমরা পুলিশের তীব্র পাহারা ব্যর্থ করিতাম তাহার কতক পরিচয় দিয়া পরে অন্য কথা বলিব।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার আমাদের সর্ব্বপ্রধান কৌশল ছিল প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কোনওরূপে প্রহরীকে:ফাঁকি দেওয়া। যদি প্রথম বাড়ির বাহির হইবার সময় পুলিশের দৃষ্টি এড়াইতে অকৃতকার্য্য হইলাম ত সেবার দলের কোন কাজ না করিয়া, দলের কাহারও সহিত দেখা না করিয়া সহপাঠীদের কাহারও বাটি চলিয়া যাইতাম অথবা বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়া সংসারের কোন কাজ লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম, বাড়ির লোকে মনে করিত "আজ যে বড় শচী সংসারের কাজে মন দিয়েছে!" আর তা না হইলে কারমাইকেল লাইব্রেরীতে গিয়া মাসিক পত্র ও খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়িয়া বাড়ী ফিরিতাম। নিতান্ত পক্ষে গ্রীষ্ম কাল হইলে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া মাথায় কিঞ্চিৎ তেল মর্দ্দন করিতে করিতে মা গঙ্গার পুণ্য সলিলে দেহ মন সিক্ত করিয়া সে যাত্রা প্রহরীকে অল্পেই নিষ্কৃতি দিতাম, কারণ কোন কোনও দিন বেচারা আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে নাকাল হইয়া যাইত। এই সকল প্রহরীদের প্রায় কাহারও সহিতই কোনরূপ ব্যক্তিগত বিরোধভাব ছিল না, চোখে চোখ পড়িলেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিতাম। হয়ত তেতালার জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেছি প্রহরী ভায়া কোথায় কোন দিকে কি অবস্থায় আছেন,

এমন অবস্থায় প্রহরীও আমায় দেখিতে পাইল, আমি জানালা ভাল করিয়া খুলিয়া দিলাম বন্ধুবর মাথা নীচু করিয়া মন্থর গতিতে স্মিত হাস্যে বাড়ির সম্মুখ দিয়া একদিকে কিছু দূরে চলিয়া গেলেন। এ সব আমরা অধিকাংশ সময় কেবল উপভোগই করিতাম। এই সকল প্রহরীদের ফাঁকি দিতে পারিলেও মহানন্দ হইত আবার ফাঁকি দিতে যাইয়া ধরা পড়িলেও একটা হাস্য কৌতুকেরই সৃষ্টি হইত কিন্তু কখন কখনও এই সব প্রখর দৃষ্টির ফলে কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইলে ইহাদের উপর ভয়ানক রাগ হইত। অনেক সময় ইহাদিগকে আমরা বুঝাইতাম "ভায়া, নিজেদের চাকুরি যে কোনও উপায়ে পার বজায় রাখ, কিন্তু এরূপে সারাদিন বাড়ির সম্মুখে বসিয়া থাকাটা কি ভাল, বাড়ীর লোকে, পাড়াপ্রতিবেশীরাই বা কি মনে করিবে। আর দেখ সরকার বাহাদুর মনে কি করিতেছেন না জানি আমরা কি ভয়ানক কার্য্যই করিতেছি, এটা তাঁহাদের ভুল বিশ্বাস, যাহা হউক তোমাদের চাকুরী তোমরা অবশ্যই বজায় রাখিবে কিন্তু বৃথা আমাদের এরূপে ক্রমাগত বিরক্ত করিও না।" এই সব গুপ্তচরদিগের অনেকে আবার ভাল মানুষও ছিল, তাহারা আমাদের সহিত এত নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিত যে তাহাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও হিংসাভাব ছিল না বরং তাহাদিগকে দেখিলে কেমন একটু সহানুভূতির ভাবই মনে আসিত। তাহারাও অধিকাংশ সময় নিতান্ত দায় পড়িয়া দিনান্তে অথবা সকাল বিকাল কেবল এইটুকুমাত্র খোঁজ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিত যে আমরা কাশীতেই আছি কি না এবং পরে বাটির‍ই নিকটবর্ত্তী কোনও গলিতে অথবা বড় রাস্তার কোনও দোকানে বসিয়া অবশিষ্ট সময় হাস্যালাপেই কাটাইয়া দিত। কিন্তু আমাদিগকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিলে অনুসরণ করিতেও ছাড়িত না। আবার এক একজন এইরূপ ভাবেই আমাদের পিছনে লাগিত যেন আমরা তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রু। আমরাও ইহাদিগকে নাকাল করিতে ছাড়িতাম না। হয়ত শুধু শুধুই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, এক গলি হইতে আর এক গলি ঘুরিয়া হঠাৎ খুব জন কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়া পাস কাটাইয়া একেবারে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইতাম। যদি গুপ্ত পুলিশ বিভাগের কোনও দারোগা এইরূপে আমাদের অবাধে পরিভ্রমণ করিতে দেখিতেন ত সে দিন যে প্রহরী আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার ভাগ্যে অম্ল মধুর রসের ব্যবস্থা হইত।

অনবরত এই সকল গুপ্তচরদিগের সহিত লুকোচুরি খেলার ফলে আমাদের

এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে ইহাদিকে দেখিবামাত্র গুপ্তচর বলিয়া অনুভব করিতে পারিতাম। আজত সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই আজ আরও স্পষ্টভাবে আমাদের নিকট ইহা প্রতিভাত হইয়াছে যে আমরা পুলিশের কৌশলের নিকট কখনও পরাস্ত হই নাই। কেবল মাত্র আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া পুলিশ একটিও নূতন লোকের পরিচয় পায় নাই। ইহারা যখন চক্ষের মত আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত সেই সময় আমরা বোমা ও রিভলভার লইয়া কাশীরই বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসা করিয়াছি আবার এইসব আমরা কাশীর বাহির হইতে আনিয়াছি এবং কাশীর বাহিরেও প্রেরণ করিয়াছি। একদিন সকাল বেলা বাড়ী ফিরিতেছিলাম, বাটির সন্নিকটে আসিয়া পড়িত পর একেবারে গুপ্ত পুলিশের দারোগার সম্মুখে, সঙ্গে আবার তাঁহার একটি অনুচর। আমায় দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমিও ঠিক তেমনই প্রফুল্ল বদনে তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। "কোথাও গিয়াছিলেন মর্ণিংওয়াক করিতে বুঝি।" আমিও বলিলাম হাঁ একটু বেড়াইয়া আসিলাম। "এটা কি" বলিয়া আমার বুক পকেটের একটি ছোট খাতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া ধরিলেন। তৎক্ষণাৎ খাতাটি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া দিলাম। খাতায় নেপোলিয়ানের কএকটি উক্তি ও ঐরূপ আরও দুই একজন খ্যাতনামা দগের জীবনের কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। খাতাটি ভাল করিয়া দেখিয়া আমায় তিনি পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমরা বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেলাম। সেই দিন সেই সময় আমার জামার নিম্নের পকেট গান্‌কটন্‌ ও ঐরূপ আরও অন্যান্য ভীষণ পদার্থে পূর্ণ ছিল।

দূর হইতে দেখিলেই যেন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিতাম যে ইহারা পুলিশের লোক। সাধারণ প্রহরীদের পাদুকা দেখিলেই অনেক সময় চিনিতে পারা যাইত। আবার অনেক সময় তাহাদের মাথার টুপি, চলিবার ভঙ্গি ও হাতে ছড়ি ধরিবার ধরণ এমন বিশিষ্ট রকমের ছিল যাহা আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে কখনও আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অথবা কখন কখনও ইহাদিগের সঙ্গীদিগকে দেখিয়া ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইত। রাজপথে চলিবার সময় আমাদের এমন কতকগুলি অভ্যাস হইয়া-গিয়াছিল যাহা জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত দূর হয়

নাই। রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে হয়ত কাহারও সহিত গল্প করিতে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং সেই অবসরে আগে পিছনে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা। রাস্তার মোড়ে একবার করিয়া পিছনে তাকানর অভ্যাসের ফলে এই সে দিনও অনেকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছি। তাহা না হইলে হয়ত কোন দোকানে কিনিবার অছিলায় অথবা অন্য কোনরূপ বাহানা করিয়া চলিতে চলিতে একবার করিয়া অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া লইয়া রাস্তা চলিতাম না। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতাম যে আমাদের এতটুকুও অসাবধনতা হইলে একজনের জন্য দলকে দল হয়ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে না দাঁড়াইয়া পিছন কথনও ফিরিতাম না। যদি একই মুখ কয়েকবার দেখিলাম ত তাহার উপর তখনই সন্দেহ হইয়া যাইত এবং সন্দেহ ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য কোনও নির্জ্জন গলিতে ঢুকিয়া পড়িতাম। তখন হয় তিনি ধরা পড়িয়া যাইতেন অথবা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনুসরণ ত্যাগ করিতে হইত। যখন এইরূপে আমাদের অনুসরণকারীকে ধরিয়া ফেলিতাম, তাহাকে কোনও রূপে ফাঁকি দেওয়াই তখন আমাদের প্রথম কাজ হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ফাঁকি দিবার প্রধান অবলম্বন ছিল নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ খুব জনবহুল স্থানে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ফেলা। তাহা ছাড়া প্রথম বাড়ীর বাহির হইবার সময়ই খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতাম এবং বিশেষ কাজের দিন অতি প্রত্যুষে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতাম। যখন বাড়ী ফিরিতাম, দেখিতাম আমার অনুসরণ কার্য্যে নিযুক্ত প্রহরীটী আমি বাড়ীতেই আছি ভাবিয়া বাড়ী আগলাইয়া বসিয়া আছে।

পুলিশের সহিত আমাদের এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় বেলা তিনটার সময় কাশী আসিয়া পঁহুছিলাম। পুলিশের চক্ষু এড়াইয়া বাড়ী গেলাম আবার বাড়ী হইতে পুনরায় দাদার বাসায় গেলাম। রাসবিহারী সেসময় কাশীতেই ছিলেন। পুলিশ কিন্তু তথনও ঘুণাক্ষরেও আমাদের গতিবিধির বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই।

দাদার সহিত পরামর্শ ঠিক হইল যে যুক্তপ্রদেশেরও সৈনিকদিগের মধ্যে বিপ্লব প্রচার আরম্ভ করিতে হইবে এবং অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশেও এই সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ৫ই ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ পৃথ্বী সিংএর সহিত দেখা শুনা হইবার পর বাঙ্গলা দেশে যাইব এইরূপ স্থির

হয়। ইতিমধ্যে কাশীর সেনাবারিকে যাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দুই একদিন যাইতে না যাইতে কাগজে পড়িলাম আমেরিকা প্রত্যাগত কিছু শিখ একটী গ্রামে টাঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন। পুলিশ সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিতে যায় ও তাঁহাদের নিকট হইতে রিভলভার ইত্যাদিও পায়। পুলিশ তাঁহাদিগকে ধরিতে যাইলে তাঁহারা গুলি চালান ও একজন পুলিশ বিশেষরূপে আহত হন। পরে প্রকাশ পায় ইঁহারা নাকি কোনও খাজানা লুট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতা যে পুলিশ দেখিবামাত্র ইঁহাদিগকে সন্দেহ করে।

এই উপলক্ষে কিন্তু গ্রামের লোকেরাও পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল। গ্রামের লোকদের ধারণা হয় যে পুলিশ মামুলি চোর ডাকাত ধরিতেছে, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অবশ্য তাহারা পুলিশকে সাহায্য করে। ইহারও কিছুদিন পরের ঘটনা বলিতেছি, তখন বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবময় ধর পাকড়ের ধূমে এক বিচিত্র কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে, ভাই-পেয়ারাসিং নামের একটি যুবককে ধরিবার জন্য পুলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ একদিন এক পুলিশঘোড়সওয়ারকে একটি যুবকের পিছনে পিছনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে দেখা গেল। এইরূপে যুবকটি প্রায় মাইল তিনেক ছুটিলেন। ঘোড়ার সহিত প্রতিযোগিতায় আর যেন পারিতেছেন না এমন সময় তাঁহারই স্বগ্রামবাসী আসিয়া পথ প্রতিরোধ করায় তিনি ধরা পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পুলিশ সওয়ার আসিয়া বহুদিনের পলাতক ভাইপেয়ারা সিংকে ধরিল। গ্রামের লোকেরা যখন জানিতে পারিল যে যাঁহাকে তাহারা ধরিয়াছে তিনি তাহা-দেরই গ্রামের সুপরিচিত ও সকলেরই বড় প্রিয় ভাই পেয়ারা সিং তখন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না। এই ভাই পেয়ারা সিংএর সহিত যিনিই মিশিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইয়াছেন তিনিই ইঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইঁহার পেয়ারা নাম সার্থক হইয়াছে। ইনি যেমন নম্র প্রকৃতির ছিলেন তেমনই ইঁহার চরিত্রের মধ্যে কেমন এক শান্ত, সমাহিত ও সুসংযত তেজেরও আভাস পাওয়া যাইত। গ্রামের লোকেরা সত্যই ইঁহার গুণে মুগ্ধ ছিল এবং বিধির নির্ব্বন্ধে এই মুগ্ধ গ্রামবাসীরাই যেন স্বহস্তে তাহাদের প্রিয়জনকে পুলিশের কবলে সমর্পণ করিল।

যাহা হউক পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারীর খবর পড়িয়া আমরা একটু বিচলিত হইলাম, কারণ প্রতিক্ষণ আমরা এই ভাবিতেছিলাম যেন এরূপ মহাসুযোগ কোনও অনবধানতার জন্য নষ্ট হইয়া না যায়। এদিকে আমাদের দলের উপযুক্ত দুই একটি ছেলেকে আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয় বলা হইল। এখন হইতে আমরা অন্য কোনও দিকে মনোযোগ না দিয়া কি করিয়া সৈনিকদিগের মন পরিবর্ত্তন করা যায় কেবল এই দিকে আমাদের সকল সামর্থ্য নিয়োগ করিলাম। একদিন আমিও আমার একটি মারাঠি বন্ধু সেনাব্যারিকের দিকে গেলাম। সোজা ব্যারিকে না গিয়া প্রথমে আমরা কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কারণ যদিই আমাদের কেহ অনুসরণ করে ত যেন সেনাব্যারিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ হইয়া না পড়ে। ষ্টেশনে পঁহুছাইবার পর রেলের লাইন ধরিয়া ব্যারিকের দিকে অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশনে পৌছাইতে ও ষ্টেশনের লম্বা প্লাটফর্ম্ম পার হইতে হইতে আমাদের কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইত। আর যখন রেলের লাইন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিতাম তখন সবই সুস্পষ্ট হইয়া যাইত। সেনাব্যারিকে যাওয়া আসার সময় কোনও দিন আমরা অনুসৃত হই নাই। রেলের লাইন আসিয়া সেনাব্যারিকের পাশ দিয়া গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড মাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে আসিয়া দেখিলাম দুইটি শিখ যুবক সেনাব্যারিক হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় বাজারের দিকে যাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, তাঁহাদের পল্টনের নাম কি, তাঁহাদের হাবিলদার কে, পল্টনে সে সময় কত লোক ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা কোথায় ছিলেন, এখান হইতে তাঁহাদের শীঘ্র বদলি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, ইংরাজব্যারিকে কত সৈন্য আছে, এবং তাহারা কতদিন ধরিয়া এখানে আছে, ইত্যাদি নানা কথা তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। সব কথারই উত্তর দিয়া তাঁহারা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমাদের উপর হামলা করিবে নাকি?' আমরাও উচ্চস্বরে এমন হাসি হাসিয়াছিলাম যে সে হাসির পর আমাদের প্রশ্নসংক্রান্ত কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। তাঁহারা একদিকে চলিয়া গেলেন, আমরা রাস্তা ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যারিকের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। ব্যারিকের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদের ভরসা হইল না। একটু পরেই আর একটি